শুকতারা
৫৪
দ্বাদশ সংখ্যা
মাঘ • ১৪০৮
১০.০০

[চলবে]

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - লাইব্রেরী

স্ক্যান করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

ভারতবর্ষে সবাধিক বিক্রীত কমিকস

ডায়মণ্ড কমিকস

এই মাসে পড়ুন

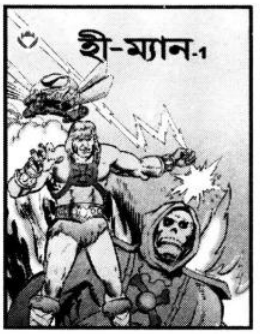

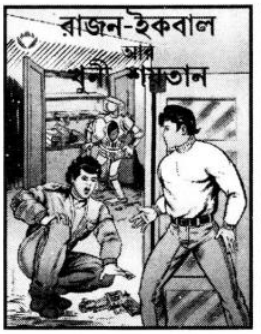

ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব-এর সদস্য হোন এবং বাড়ী বসে ৫০ টাকার কমিকস ৪৫ টাকায় নিন। ডাক ব্যয় ৬ টাকাও আর আলাদা করে দিতে হবে না। এই ভাবে প্রতি মাসে ডায়মণ্ড কমিকসের ৫-টি কমিকসের সেট আপনি বাড়ী বসেই পেতে পারেন। এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ বা ভারতের বাইরে আর কোন দেশে প্রযোজ্য হবে না। সদস্যতা কুপন ভরে পাঠাবার সময়ই সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা আপনি ডাক টিকিটের মাধ্যমে পাঠান। নিজের নাম-এবং ঠিকানা ইংরাজীতে স্পষ্ট করে লিখুন। সময়ে-সময়ে আপনাকে অন্যান্য উপহারও পাঠানো হবে। লাগাতার ১২-টি ভি.পি. ছাড়লে ১৩ নম্বর ভি.পি. ফ্রী। ডায়মণ্ড পরিবারের সদস্য হোন এবং মনোরঞ্জনের দুনিয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলুন।

এক বছরে মাস	কনশেসন (টাকা)	মোট সঞ্চয় (টাকা)
১২	৫.০০ (কনশেসন)	৬০.০০
১২	৬.০০ (ডাক খরচ)	৭২.০০
১	৫০.০০ (১৩ নং ভি.পি. ফ্রী)	৫০.০০
সদস্যতা প্রমাণপত্র এবং অন্য আকর্ষক উপহার, স্টিকার এবং ডায়মণ্ড পুস্তক সমাচার ফ্রী		২০.০০
		২০২.০০

সদস্য হওয়ার জন্য আপনি কেবল নীচের কুপনটি ভরে পাঠান এবং সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট অথবা মানি অর্ডারের রূপে অবশ্যই পাঠান। এই স্কীমের অন্তর্গত প্রতি মাসে ২০ তারিখে আপনাকে ভি.পি. পাঠানো হবে, যাতে ৬-টি কমিকস থাকবে।

হ্যাঁ! আমি '**ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব**'-এর সদস্য হতে চাই এবং আপনাদের দ্বারা দেওয়া সুবিধাগুলো পেতে চাই। আমি নিয়মগুলো ভাল করে পড়ে নিয়েছি। আমি কথা দিচ্ছি প্রতি মাসে ভি. পি. ছাড়িয়ে নেব।

নাম : _____

ঠিকানা : _____

পোস্ট : _____ জেলা : _____

পিন কোড : _____

সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট / মানি অর্ডারের রূপে পাঠাচ্ছি।

আমার জন্মদিন : _____

নোট : সদস্যতা শুল্ক পাওয়ার পরই সদস্যতা দেওয়া হবে।

এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ অথবা অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ডায়মণ্ড কমিকস প্রা. লি. 257, দরিবা কলান, দিল্লী-110 006

বাঁটুলদি গ্রেট

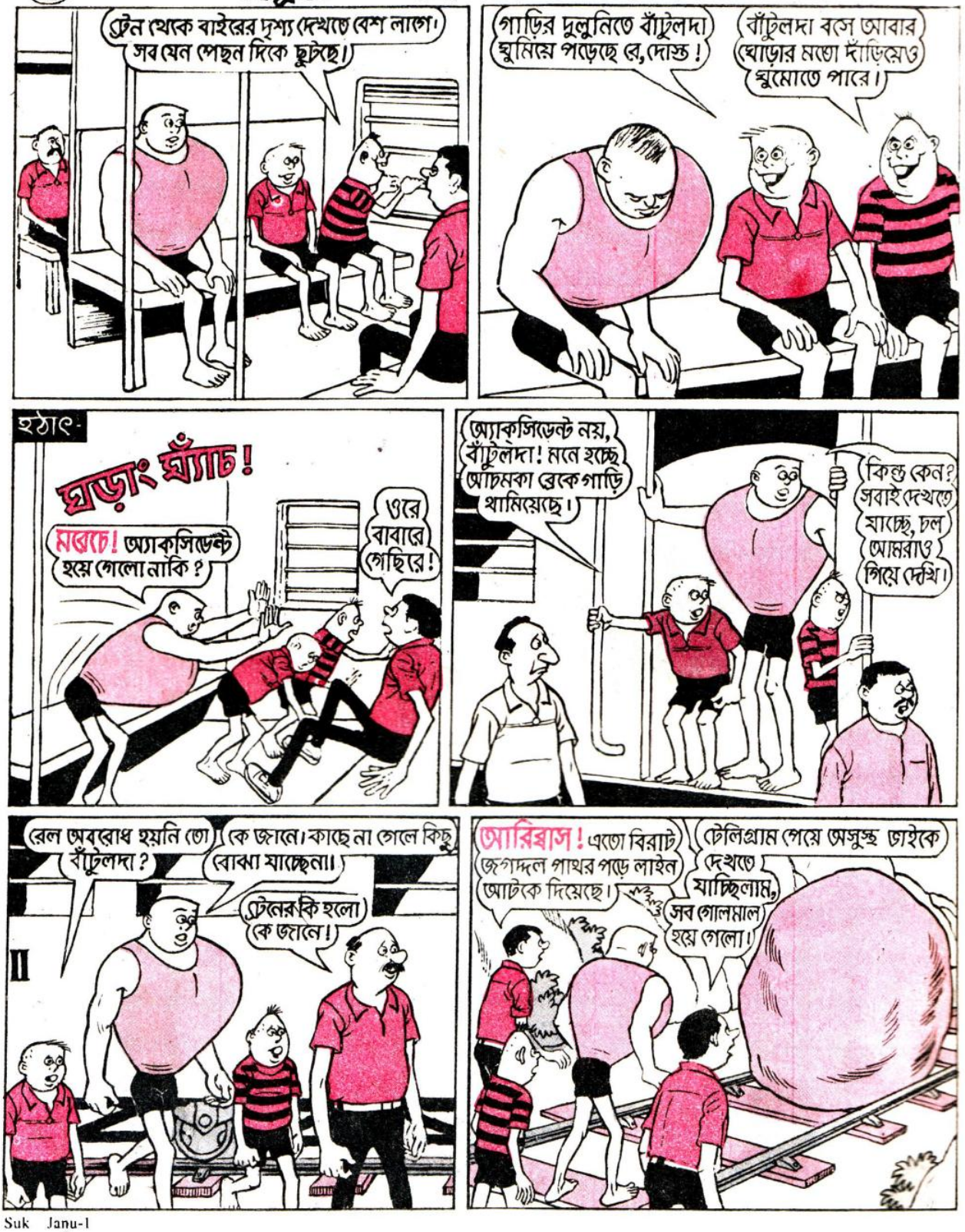

Suk Janu-1

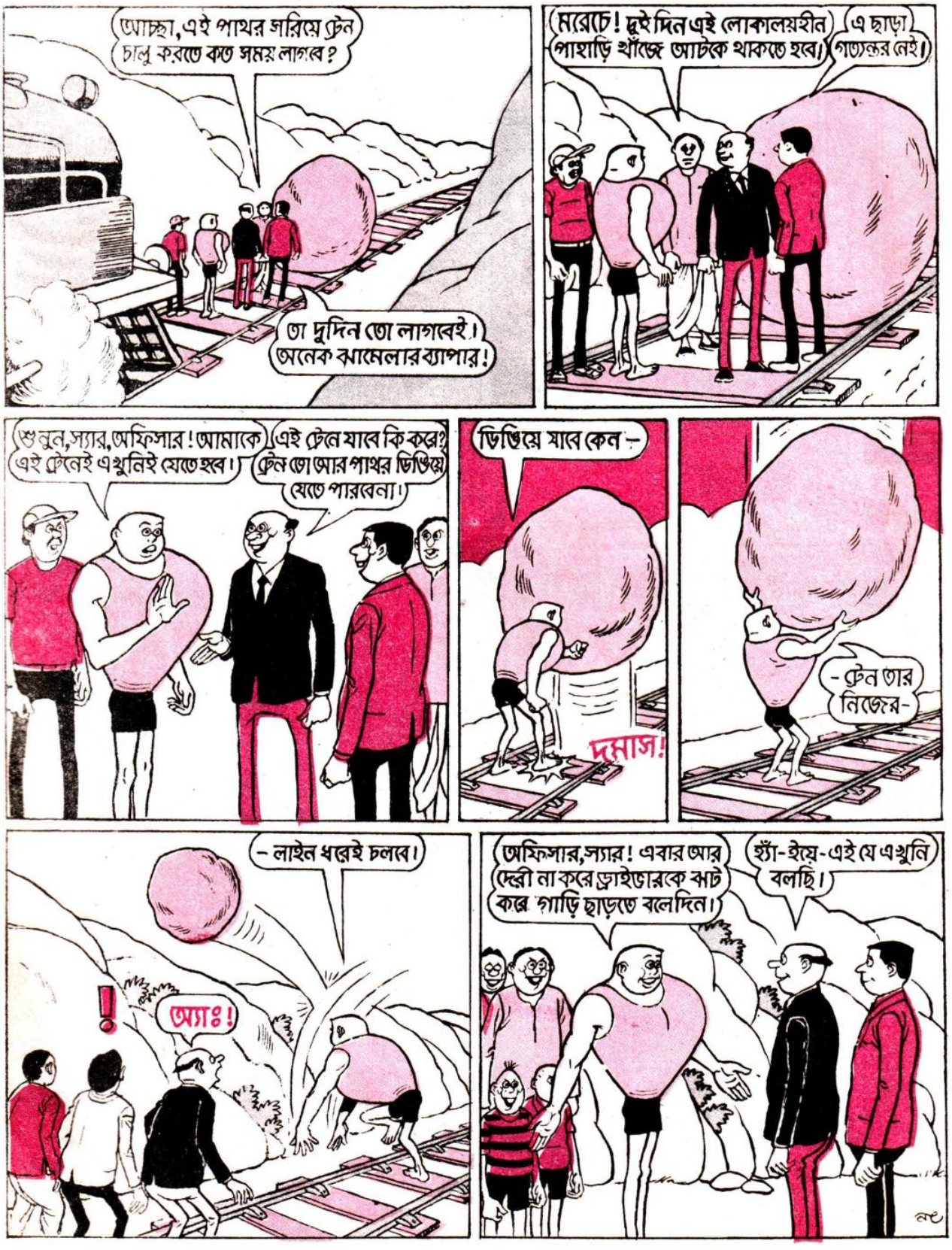
আচ্ছা, এই পাথর সরিয়ে ট্রেন চালু করতে কত সময় লাগবে?
তা দুদিন তো লাগবেই। অনেক ঝামেলার ব্যাপার!
মরেছে! দুই দিন এই লোকালয়হীন পাহাড়ি খাঁজে আটকে থাকতে হবে।
এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।
শুনুন, স্যার, অফিসার! আমাকে এই ট্রেনেই এখুনিই যেতে হবে।
এই ট্রেনে যাবে কি করে? ট্রেন তো আর পাথর ডিঙিয়ে যেতে পারবেনা।
ডিঙিয়ে যাবে কেন –
দুমাস!
– ট্রেন তার নিজের –
– লাইন ধরেই চলবে।
!
অ্যাঃ!
অফিসার, স্যার! এবার আর দেরী না করে ড্রাইভারকে ঝট করে গাড়ি ছাড়তে বলে দিন।
হ্যাঁ-হ্যে-এই যে এখুনি বলছি।

শুকতারা

সূচীপত্র

মাঘ ১৪০৮
জানুয়ারি ২০০২
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

Approved by the Directorate of Public Instruction West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide Memo No. 456 (17) T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য হাতে নিলে ১১০ টাকা, ডাকে ঃ বুকপোস্টে ১৫০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ৩২৫ টাকা।

Annual Subscription : UK and USA—By Air Mail Rs.645.00.
R.N.I Registration No. 2621/57
ফোন নং ঃ ৩৫০-৪২৯৪, ৩৫০-৪২৯৫, ৩৫০-৭৮৮৭
ই-মেল নং ঃ devsahitya@calt:ger.com

মূল্য ঃ দশ টাকা

বিশেষ হাস্য-কৌতুক সংখ্যা

গা ছমছমে ভৌতিক সংখ্যার পর এবার দমফাটা হাসির পালা।

এই সংখ্যায় তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো এমন বারোটি হাসির গল্প যা পড়লেই হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ.....রামগরুড়ের ছানারা তখন পালাতে পথ পাবে না।

মাসির বাড়ির হাসির গল্প
—হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় ৬
দারোগার গোঁফ চুরি
—রণজিৎ মিত্র ১৩
পল্টুর উল্টো কাজ
—অমিয় দত্ত ১৭
কাগুজে ডাকাত
—বিপুল মজুমদার ২৬
ফটিকের ফুল নম্বর রহস্য
—সুদর্শন নন্দী ৬৬
সদানন্দ ফিরে আসেন
—সুখেন্দু দত্ত ৬৮
৭-তলা মামাবাড়ি
—সুবোধ তালুকদার ৭০
এইজন্যই যত সমস্যা
—নীলেশ কুমার লায়েক ৫৯
নেই মামার কানা মামা
—নারায়ণ সাহা ৫৬

মরে কাঠ হয়ে গেল
—কমল চট্টোপাধ্যায় ৫১
চোরের উপর বাটপাড়ি,
পকেটমারের উপর.....
—পিনাকী রঞ্জন দাশ ৫৪
রামুর রামছাগল
—দীপক কর ৪৮

ধারাবাহিক

৮

কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে ঘাপটি মেরে বসে আছেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আর জয়ন্ত। ওদিকে দুটো লোক মাটি খুঁড়ে চলেছে। আচমকা জয়ন্তকে ইশারা করেই রিভলভার হাতে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গোয়েন্দা উপন্যাস তিতলিপুরের জঙ্গলে।

ফিরে দেখা

৩২

ফিরে দেখা বিভাগে পুরনো শুকতারা থেকে এক এক করে তুলে আনা হচ্ছে শিশু-সাহিত্যের কিছু মণি-মাণিক্য। হাস্য-কৌতুক সংখ্যায় এবারে তাই আছে হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্ত্তীর মজাদার গল্প— বাজিরাও—অদ্বিতীয়।

৩৪

সাহেব এসেছেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। একটা কুকুর আর একটা সারস, নির্জন দুপুরে লোকাভাবে তারাই নিয়ে চলল সাহেবকে স্বামীজীর কাছে। ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর লেখা জন্মমাসের শ্রদ্ধার্ঘ্য বাঘা, মটরু এবং তিনি।

২০

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি। চারদিকে চলছে দেবী সরস্বতীর আরাধনা। কিন্তু কে প্রথম তাঁর পূজা করেন তা কজনে জানে? বেদে বা পুরাণে কী রূপে তিনি বর্ণিত, তাঁর বাহনই বা কে, কোথায় পূজিত তিনি—সব তথ্যাদি নিয়ে পথিক মণ্ডলের লেখা—বিদ্যার দেবী সরস্বতী।

পুরস্কৃত গল্প

৩৭

ভাঁটার টান (প্রথম)
—সৌরভ কুমার ভূঞ্যা
তিন বউ (দ্বিতীয়)
—শিপ্রা ভৌমিক ৩৮

ফিচার

কেরিয়ার গাইড —ডি. এ. চন্দ্রণ ৫০
বিজ্ঞানের খবর —সন্দীপ সেন ২৯
গল্প হলেও সত্যি
—তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬
বিশ্ব বিচিত্রা —মনতোষ মিশ্র ১২

ক্রীড়াঙ্গন

খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১
উঠছে যারা—বীরু বসু ৪৭

কবিতা ও ছড়া

মামার বিপদ—ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৫
রাজযোটক—শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫
বইমেলাতে খোকন
—সায়ন্তনী পাল ৬৫
মজার খেলা জাগলিং
—অভয় মিত্র ৬৫

বিভাগীয় লেখা

চিঠিপত্র ৩৬
মনের জানলা
—জগদিন্দ্র মণ্ডল ২৮
আমরা বলছি ২৪
দাদুমণির চিঠি ২১
তোমাদের পাতা ২২
মজার পাতা ৬২

ছবিতে গল্প

১

বাঁটুল দি গ্রেট
—নারায়ণ দেবনাথ
হাঁদা-ভোঁদা
—নারায়ণ দেবনাথ ৩০
কার্টুন ঃ সুফি ২৯, ৬৪
প্রচ্ছদ ঃ খুনে বিজ্ঞানীর দ্বীপে
—নারায়ণ দেবনাথ

ঘোষণা

সুশীল কুমার সরকার স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৪০
জানো কী! ৫৮

৫৪ বর্ষ • ১২শ সংখ্যা • মাঘ ১৪০৮ • জানুয়ারি ২০০২

মামার বিপদ

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

চেহারা মামার খুব মোটাসোটা
বেঁটেখাটো গোলগাল,
শখ করে 'স্যুট' কিনলেন কাল
রঙ টকটকে লাল!

সেই গাঢ়-লাল স্যুট পরে মামা
দশটায় বাসে চড়ে
মনে খুশি নিয়ে দাঁড়ালেন গিয়ে
ধর্মতলার মোড়ে!

অফিসের বেলা, মানুষের মেলা
লোকজন থইথই,
হাজার-হাজার দোকান-বাজার
হুল্লোড়-হইচই।

বেঁটেখাটো মামা গায়ে লাল-জামা
ওঠে ভিড়ে ঘেমে-নেয়ে,
যত লোক যায়, অবাক চোখেতে
থাকে তারই দিকে চেয়ে!

ঠাসা ফুটপাত, খাসা উৎপাত
সেকী ঠেলাঠেলি ভাই,
মামা এককোণে দাঁড়িয়েই মনে
ভাবলেন তুলি 'হাই'!

যেই মামা জোরে মুখ ফাঁক করে
তুললেন 'হাই' সুখে,
'চিঠির বাক্স' ভেবে লোকে চিঠি
ফেলতে লাগল মুখে!

ছবি সুফি

মাসির বাড়ির হাসির গল্প

হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার মাসির বাড়িতে গেলে হাসতে হবে। হাসতেই হবে, কারণ মাসির বাড়িতে হাসির কাণ্ডকারবার লেগে থাকে সারাদিনই। আমার মাসির নাম মীনা। আসল নাম বলে দিলাম বলে মাসি হয়তো একটু রেগে যাবেন, কিন্তু মাসি বেশিক্ষণ রেগে থাকতে পারেন না—এটা একটা সুবিধে। মাসি সারাদিন ধরে ভাল ভাল রান্না করেন। তবে বেশি রেগে গেলে সেসব ভাল ভাল জিনিস আর খেতেই দেবেন না, এই ভয়টা আমার আছে। আমার মেসোমশাই সদাশিব মানুষ। তিনি একজন গ্রন্থকীট। মীনামাসি, তাঁর ছেলে-মেয়েরা আর তাদের পোষ্যগুলি যে কী কাণ্ডটাই দিনভর করে বেড়ায় সে দিকে তাঁর নজরই পড়ে না। আর পড়বেই বা কি করে? সারাটা দিন তো আপিসে কাটে তাঁর। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকেন সেটুকু সময় কাটে বইকে আশ্রয় করে। তাই মীনামাসি নিশ্চিন্ত মনে তাঁর সংসারধর্ম পালন করেন।

মীনামাসির আগের বাড়িতে একটা কুকুর ছিল। তার নাম ছিল লাট্টু। লাট্টু বাড়িময় লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেত। মাঝে মাঝে দেখা যেত একটা স্কেলের মতো লম্বা কাঠের টুকরো নিয়ে সে সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর তার পেছনে রে রে করে মীনামাসি দৌড়চ্ছেন। লাট্টু একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে ছাদ, সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠোন—এভাবে বার চার-পাঁচ মীনামাসিকে দৌড় করিয়ে তবে গিয়ে এক জায়গায় থামত, আর তখন মীনামাসি অনেক কসরৎ করে কাঠটা লাট্টুর মুখ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রাগে গরগর করতে করতে বলতেন, তোর জন্য কি আমার একটু নিশ্চিন্তে রাঁধবার জো নেই। তখন থেকে তোকে বলছি খুন্তিটা দে, তা তুই সারাবাড়ি আমাকে দৌড় করালি! এতক্ষণে গিয়ে দেখব ভাজাটাজাগুলো সব পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। পরে জেনেছিলাম কাঠের স্কেলটা হলো গিয়ে মীনামাসির নন-স্টিক প্যানের খুন্তি।

মীনামাসি বাড়ি বদল করে নতুন ফ্ল্যাটে এসেছেন। নতুন বাড়িতে ছটা বেড়াল পোষা হয়েছে। লাট্টু মারা গেছে বলে মীনামাসি আর কুকুর পুষতে চাননি। নেহাত ফ্ল্যাটবাড়ি, তাই আরো বেড়াল রাখা যায়নি বলে মীনামাসির খুব দুঃখ। যাই হোক মীনামাসির নতুন ফ্ল্যাটে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েছি বহুদিন, যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। সেদিন দুপুরে হাতে কিছু সময় পেয়ে গেলাম, ভাবলাম মীনামাসির সঙ্গে একটু দেখা করে যাই। বেলা একটু গড়িয়ে গিয়েছে বলে ভাবছিলাম এতো বেলায় কারো বাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। তারপর ভাবলাম মীনামাসির কাছে যাওয়াই যায়। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে চলেই গেলাম মীনামাসির কাছে। অনেকগুলো ফ্ল্যাটের মধ্যে মীনামাসিরটি খুঁজতে বিশেষ অসুবিধে হলো না কারণ দূর থেকেই দেখতে পেলাম একটা দরজার সামনে দুটো মোটাসোটা কুকুর নিশ্চিন্তে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তাদের ডিঙিয়ে বেল বাজালাম। মীনামাসিই দরজা খুললেন, চারটে বেড়াল তখন তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ছিল। আমি বললাম, এত বেলায় তোমাকে বিরক্ত করতে এলাম, নিশ্চয় ঘুমোচ্ছিলে? মীনামাসি বললেন, আরে না না, আমার তো এখনো রান্নাই শেষ হয়নি। ভালই হয়েছে, তুই এতদিন পরে এলি, খেয়ে যাবি।

খাব না, খাব না বলে বসবার ঘরে এসে বসলাম। গাবদা গদিওয়ালা সোফাটাতেই বসেছিলাম, আমার পাশে দেখলাম একটা হুমদো হুলো চিংড়িমাছের মতো গোল হয়ে ঘুমোচ্ছে। মীনামাসি বললেন, দেখিস ওটার আবার একটু আঁচড়ে কামড়ে দেওয়ার অভ্যেস আছে। দেখ না আমার শাড়িটা কি করে দিল। ওমা! সত্যিই তো এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি মীনামাসির পরনের শাড়ির একদিকটা ফালা ফালা হয়ে ঝুলছে। আমি পুরোপুরি বিস্মিত হয়ে ওঠবার আগেই মীনামাসি অ্যাপোলজির সুরে বলতে লাগলেন, কী আর করবে বল! অবলা জীব, ফ্ল্যাটবাড়িতে আর গাছের গুঁড়ি কোথায় পাবে? ওদের নখ ধার করতে হয় যে! তাই যখন ওদের নখ সুড়সুড় করে ওঠে তখন ওরা আমার শাড়ি আঁচড়ায়। আমি ওদের আবদার মেনে নিয়েছি ভাই! কি আর করি! আমি আজকাল ছেঁড়া শাড়িগুলোই পরছি।

আমার মুখটা বিঘৎ খানিক হাঁ হয়ে ছিল বোধহয়, তাই দেখে মীনামাসি বললেন, আহা, তোর খিদে পেয়েছে দেখছি। আমার রান্না আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই হয়ে যাবে, তুই ভাই একটু বোস। আর শোন, সোফার হাতলটাতে হাত রাখিসনি যেন, ওটা আবার কেলেটার ফেভারিট জায়গা। ও যদি বসতে আসে তবে একটু কো-অপারেট করিস! বলতে বলতে মীনামাসি রান্নাঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর অমনি গোটা চারেক বেড়াল স্ফিংসের

মূর্তির মতো রান্নাঘরের দরজার সামনে বসে পড়ল।

আমি একটু জিরিয়ে নিয়ে চলে যাব ভাবছি, এমন সময় মাসি প্লেটে করে একগাদা পিজার টুকরো এনে সামনে ধরে দিয়ে বললেন, নে, খেয়ে নে এগুলো। আমরা আজ দুপুরে পিজা লাঞ্চ করব, ভালই হলো তুইও খা গোটা কয়েক। কফি করে দেব তারপর। বেড়ালগুলোর আজ খেতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বেড়ালগুলোও পিজা খাবে নাকি? মীনামাসি বললেন, ওরা খাবে পিজা? ওদের জন্য ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত হয়েছে। শুনেই তো আমার জিভে জল এসে গেল। ভাবলাম মীনামাসির বাড়ির বেড়াল হয়ে জন্মাতে হবে সামনের বার।

আমি আমার পিজা আর কফি শেষ করলাম। ততক্ষণে বেড়ালদেরও লাঞ্চ শেষ হলো। এবার বেড়ালরা সব ঘুমোবার বন্দোবস্ত করতে লাগল। বিচিত্র জায়গায় তারা ঘুমোয়। কেউ গিয়ে শুলো পেলমেটের উপর, আবার কারো পছন্দের জায়গা হলো টিভির মাথা। মীনামাসি বললেন, তুই ভাই ওদের একটু শোবার জায়গা করে দে। সোফাটাতেই ওরা শোবে, ভয়ানক পাজি কিনা। তুই না হয় মোড়াটা নিয়ে বোস। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না, আমি এবার চলে যাব। তোমাদের নতুন ফ্ল্যাট দেখতে এসেছিলাম, দেখা তো হলো, এবার চলি। তোমার শরীর ভাল আছে? তা মেসোর খবর কি?

মীনামাসি টপ করে মুখের মধ্যে পান আর জর্দা চালান করে দিয়ে বললেন, আর বলিস না, সেদিনের সেই টেনশনের পর থেকে তোর মেসোর প্রেশার বড্ড বেড়ে গিয়েছিল, তবে ওষুধ-বিষুধ খেয়ে এখন একটু সামলেছে।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম, আবার বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম, টেনশনের ব্যাপারটা কি? মীনামাসি পানের বোঁটার আগা থেকে চুনটা চেটে নিয়ে বললেন, ব্যাপারটা কিছুই নয়। বেড়ালদের চান করাতে গিয়ে একটু মুশকিল হয়েছিল। সে অবশ্য তেমন কোনো গুরুতর ব্যাপারই নয়। তুই আবার শুনলে হাসবি। আমি বললাম, কক্ষণো নয়, তোমাদের মুশকিল হয়েছে শুনলে আমি হাসতে যাব কেন? আগে যদি বা হাসা যেত, তোমার হাতের অপূর্ব পিজা আর কফি খাওয়ার পর আর কী হাসা যায়?

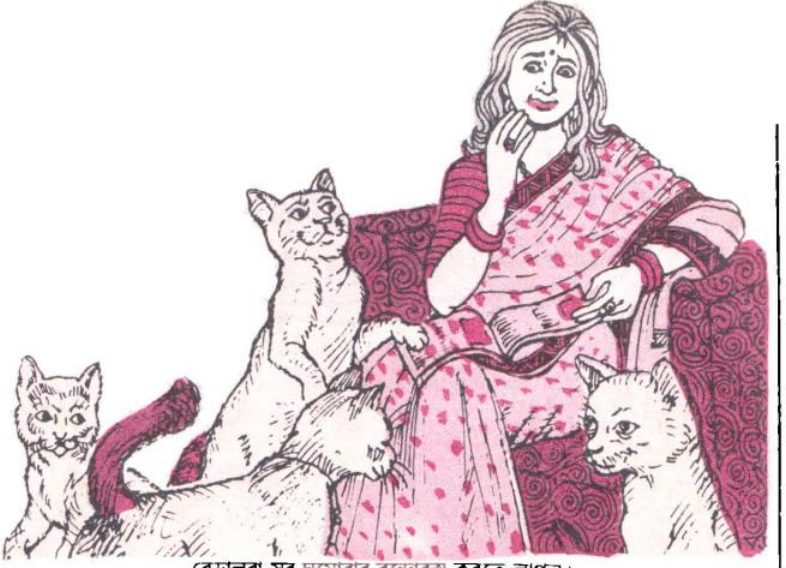

বেড়ালরা সব ঘুমোবার বন্দোবস্ত করতে লাগল।

তাও মীনামাসি কিন্তু কিন্তু করছেন দেখে মীনামাসির মেয়ে মামণি বলল, আমি বলছি। সেদিন কেলো আর লালু খুব কাদা মেখে বাড়ি ফিরেছে। ওরা কাদা মেখে ফিরলেই আমরা আতঙ্কে থাকি কারণ ওদের যখন তখন বিছানায় উঠে গড়াগড়ি দেওয়া অভ্যেস আছে। এছাড়া সোফাতেই তো ওদের আস্তানা। তাই আমি আর মা মিলে লালু আর কেলোকে নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকেছিলাম, ওদের গা পরিষ্কার করে দেবার জন্য। বেড়ালদের স্নান করানো যে কী কঠিন কাজ তা তো জানোই! তার উপর আবার কেলোটা বেশি বুনো, তাই আঁচড়ে কামড়ে দেয় একটু বেশি। দুটো খালি দরজার ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। মা কোনোরকমে দুজনকে বগলদাবা করে রেখেছেন আর আমি সাবান মাখাচ্ছি। শেষে মা ভাইকে বললেন বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে। তুমি তো জানোই ভাই কিরকম ভুলো আর অন্যমনস্ক। ও তো মার কথামতো বাইরে থেকে ছিটকিনি টেনে দিয়েছে। দেবার পর ওর হঠাৎ মনে হয়েছে কেমিস্ট্রি বইটা বন্ধুর বাড়িতে রয়ে গেছে, সেটা তক্ষুণি নিয়ে আসতে হবে। যেইনা মনে হওয়া, অমনি ভাই তো বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে দরজার ল্যাচ টেনে দিয়ে। দরজার চাবিটা যে নিতে হবে সেকথা ওর মনে নেই। আমাদের অবস্থা একবার ভাব, বাথরুমের মধ্যে দুই ধেড়ে বেড়ালসহ আমরা রয়েছি। বেড়ালদের পরিষ্কার করে বাথরুম থেকে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ভাইকে ডেকে ডেকে সাড়া পাই না। তখন আমি আর মা অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে বাথরুমের মেঝেতেই বসে রইলাম। লালু আর কেলো বেচারা তো রীতিমতো ঠক ঠক করে কাঁপছিল। আমাদের অবস্থাও খুব খারাপ। ভাই ফিরে এসে দরজার বেল বাজাচ্ছে শুনলাম, কিন্তু আমাদের দরজা কে খুলবে? শেষকালে আমরা বাথরুমের জানলা দিয়ে খুব চিৎকার-চেঁচামেচি করাতে রাস্তার লোকেরা আমাদের দেখতে পেল। তারপর তারা বাথরুমের জানলার তলায় এসে জিজ্ঞেস করতে লাগল কি হয়েছে? মা তখন তাদের বাবার অফিসের ফোন নম্বর দিয়ে বললেন বাবাকে খবর দিতে। আমাদের বাড়ির একটা চাবি বাবার কাছে থাকে কিনা। এদিকে ভাই বেল বাজিয়ে দেখেছে যে কেউ খুলছে না, তাই সে বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে চলে গেছে। বাবা এসে ঘণ্টাখানেক পর আমাদের উদ্ধার করলেন। অচেনা লোকদের ফোন পেয়ে বাবা খুবই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন আর বাড়ি এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন। তাই শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল।

মীনামাসি নিশ্চিন্ত মনে আর একটু জর্দা খেয়ে বললেন, এরা যে কেন এত দুশ্চিন্তা করে তা বুঝতে পারি না। বয়স হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। আমি আর মামণি বাথরুমে বসে বসে কত পুরোনোদিনের গল্প করলাম। এমনিতে তো ও ওর পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর আমি ঘর-সংসার নিয়ে নিশ্বাস ফেলবার সময় পাই না। একান্তে রসে গল্প করবার সুযোগ আর সময় কোথায় আর হয় বল আজকের দিনে! বেড়াল দুটোর জন্যই চিন্তা হচ্ছিল, ওদের আবার সর্দির ধাত আছে কিনা, নইলে আমরা দুজনে বেশ কাটালাম সেদিনের দুপুরটা।

তাই বলছিলাম আমার মাসির বাড়ি গেলে হাসি পাবেই।

ছবি : সনৎ কুমার দাস

তিতলিপুরের জঙ্গলে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

২

খাওয়ার পর দক্ষিণের বারান্দায় কর্নেল ও আমি রোদে বসে আছি। এমন সময় পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে দানবের মতো অতিকায় একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এলেন। তাঁর গায়ের রঙ কালো। কিন্তু পাকানো গোঁফের নিচে সাদা দাঁতের হাসি ঝকমক করছিল। কর্নেলের কাছে এসে তিনি করজোড়ে নমস্কার করে বললেন—আমার সৌভাগ্য! এখানে কর্নেলসায়েবের মতো বিখ্যাত মানুষের দর্শন পাব কল্পনাও করিনি। আপনার কত নাম শুনেছি আমাদের পুলিশ মহলে। রমেন বলছিল, একজন কর্নেল-সায়েব এসেছেন। জিজ্ঞেস করতে বলল, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

কর্নেল বললেন—আপনার কথাও শুনেছি। আপনি চন্দ্রপুর থানার ও সি মিঃ রাজেন্দ্র কুমার হাটি।

'বড়বাবু' খাকি পোশাকে ঢাকা তাঁর প্রকাণ্ড ভুঁড়ি কাঁপিয়ে অট্টহাসি হাসলেন।—কর্নেলসায়েব! আপনার নাকি পিছনেও একটা চোখ আছে। যাই হোক, আমাকে এখনই থানায় ফিরতে হবে। কিংবদন্তির নায়ককে একবার চোখের দেখা দেখতে এলাম। এই অধম যদি আপনার কোনও উপকারে লাগে, প্লিজ স্মরণ করবেন। ক'দিন থাকছেন স্যার?

—কিছু ঠিক নেই। আমি এসেছি দুর্লভ প্রজাতির নীল সারসের খোঁজে!

দারোগাবাবু আবার হাসলেন।—আপনার এসব হবির কথাও শুনেছি। কলকাতার লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে সাব-ইন্সপেকটর নরেশ ধর আমার মাসতুতো ভাই স্যার।

—বাঃ! নরেশবাবুকে বলব আপনার কথা।.....

আরও কিছু কথাবার্তার পর পুলিশ অফিসার রাজেন হাটি চলে গেলেন। একটু পরে গেটের ভিতর দিয়ে সেই পুলিশ জিপটা বেরিয়ে গেল। পিছনে বন্দুক হাতে কনস্টেবলদের দেখা যাচ্ছিল।

বললাম—তখন বলছিলেন না জেনে বিষধর সাপের লেজে পা দিয়েছি। এবার রাজেন হাটির মতো জাঁদরেল পুলিশ অফিসার বেদে হয়ে সাপটার বিষদাঁত ভেঙে—

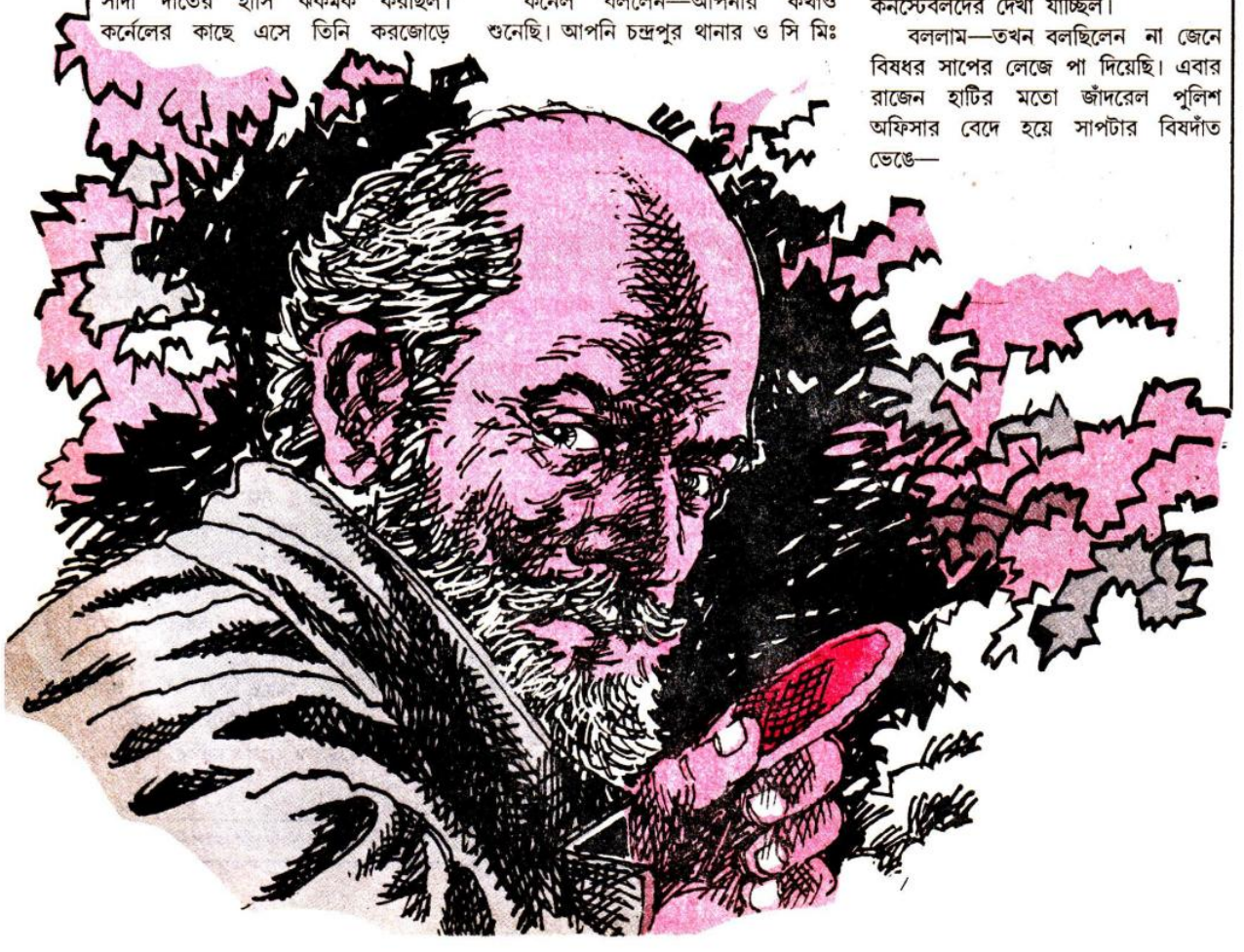

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ও কথা নয়। চলো। বেরুনো যাক।

—কোথায় যাবেন?

—প্রশ্ন নয়। শীগগির রেডি হয়ে বেরিয়ে এসো। সঙ্গে তোমার ফায়ার আর্মস নিয়ো।

কথাটা শুনে একটা অস্বস্তিতে শরীরে যেন শিহরন ঘটে গিয়েছিল। একটু পরে কর্নেলের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সদর গেট পেরিয়ে কর্নেল পিচের রাস্তায় যেদিক থেকে এসেছি, সেইদিকে হাঁটছিলেন। ডাইনে ঝিল পেরিয়ে গিয়ে কর্নেল সোজা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন। ঝরাপাতার স্তূপে জুতোর চাপ অদ্ভুত শব্দ করছিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা জাহান খাঁর কেল্লাবাড়ি এলাকায় ঢুকেছিলাম। শীতের বিকেলে সেখানে এখনই গাঢ় ছায়া। ধ্বংসস্তূপে জঙ্গল গজিয়ে আছে। মাঝে মাঝে একটা ভাঙা পাঁচিল, গম্বুজ ঘর এবং গম্বুজে ফাটল, একটা দেউড়ি, তারপর মুখ থুবড়ে পড়া মসজিদ চোখে পড়েছিল। কর্নেল কখনও একটু থেমে বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিচ্ছিলেন। একবার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—নীল সারসের দলটা খুঁজছেন নাকি? কর্নেল শুধু বলেছিলেন—হুঁ।

দ্রুত দিনের আলো কমে যাচ্ছিল। ফাঁকা জায়গা থেকে অদূরে কুয়াশার পর্দা দেখতে পাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল আমার কাঁধে হাত চেপে আমাকে বসিয়ে দিলেন এবং নিজেও গুঁড়ি মেরে বসলেন। তারপর কানে এল, সামনের দিকে ঝরাপাতার উপর পা ফেলে কে যেন হেঁটে আসছে।

একসময় শব্দটা থেমে গেল। আমরা একটা ভাঙা গম্বুজের আড়ালে ছিলাম। মাটিতে বসে-যাওয়া গম্বুজের চারপাশে ঝোপঝাড়। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে এল। এখন শীতের হাওয়াটা বন্ধ। মাঝে মাঝে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল। কে সিগারেট টানছে, দেখার জন্য একটু সরে যাচ্ছিলাম। কর্নেল আমাকে টেনে ধরে বাধা দিলেন। সময় কাটছিল না। কতক্ষণ পরে আবার শুকনো পাতার উপর শব্দ শোনা গেল। লোকটা চলে যাচ্ছে ভেবেছিলাম। কিন্তু তখনই কেউ চাপা স্বরে বলে উঠল—এত দেরি করলে কেন? অন্ধকার হয়ে যাবে শীগগির। খামোকা—

তার কথার উপর অন্যজন বলল—টর্চ আনোনি?

—এনেছি।

—আমিও এনেছি।

—তাহলে অসুবিধে কীসের? তুমি খুঁড়বে। আমি আলো দেখাব। আমি খুঁড়ব। তুমি আলো দেখাবে।

—বাবু দাগ দিয়ে রেখে গেছেন। কই সেই দাগ?

—এই যে। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি।

—ভাবছটা কী? সামান্য কাজ।

—সামান্য নয় হে। পাথরের স্ল্যাব। তলায় কতটা পোঁতা আছে কে জানে। তাছাড়া স্ল্যাবের তলায় যদি পেতলের নলটা না থাকে?

—থাকবেই। বাবু গতবছর স্ল্যাবের তলায় ওটা পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন। তখন আমিই স্ল্যাবটার এখানে সুড়ঙ্গ মতো করেছিলাম।

—তাহলে তো তুমি সেই জায়গাটা চেনো। আমি আলো জ্বালি। তুমি সেখানটা খোঁড়ো।

এবার টর্চের আলোর একটু ঝলকানি দেখতে পেলাম। তারপর খোঁড়ার শব্দ। একটু পরে একজন বলল—আচ্ছা, ফরেস্ট গার্ডটা যদি হঠাৎ এসে পড়ে?

—তোমার মাথাখারাপ? এই শীতের সন্ধ্যায় ব্যাটারা ফরেস্টবাংলোর কাছাকাছি কোথাও থাকবে। আমরা তো গাছ কাটছি না যে সেই শব্দ শুনে দৌড়ে আসবে।

আবার মাটি খোঁড়ার শব্দ হতে থাকল। এবার কর্নেল আমাকে টেনে নিয়ে একটু পিছনে একটা ঝোপের আড়ালে গেলেন। তারপর গুঁড়ি মেরে বসে শুকনো পাতার ওপর জুতোর চাপা শব্দ করতে থাকলেন।

অমনই লোকদুটো একসঙ্গে বলে উঠল—কীসের শব্দ?

—এই! কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে সেবার বাঘ এসেছিল। বাঘ নয় তো?

—কিছু বলা যায় না। সঙ্গে মেশিন আছে। আন্দাজে গুলি ছুড়ব? যদি ভয় পেয়ে পালায়!

—ঠিক বলেছ। কিন্তু তোমার দিশি পিস্তলের শব্দ শুনে বাঘ যদি উল্টে খেপে ওঠে?

তখনই কর্নেল আমাকে উঠে দাঁড়াতে ইশারা করলেন। আবছা আঁধার এখন ঘন হয়েছে। কর্নেল টর্চের আলো ফেলে তাঁর রিভলভারের নল সেই আলোতে দেখিয়ে গর্জন করে উঠলেন—কোন ব্যাটা রে?

তাঁর দেখাদেখি আমিও টর্চ জ্বেলে উৎসাহের আতিশয্যে রিভলভার থেকে তাদের মাথার উপর দিয়ে এক রাউন্ড ফায়ার করে ফেললাম।

দুটো লোক একলাফে একটা ধ্বংস-স্তূপের আড়ালে চলে গেল। কর্নেল সেদিকে টর্চ জ্বেলে আবার বিকট গর্জন করে এগিয়ে গেলেন। আমি পায়ের কাছে আলো ফেলে দেখলাম, একটা পাথরের স্ল্যাব কোনাকুনি মাটির তলায় ডুবে আছে। একটা ছোট্ট শাবল পড়ে আছে। পাথরের পাশে গর্ত খুঁড়ে একগাদা মাটি তোলা হয়েছে।

কিন্তু কর্নেলের পাত্তা নেই। শুধু একবার করে টর্চের আলোর ঝলকানি দেখতে পাচ্ছি। কর্নেল ওদের তাড়া করে যাচ্ছেন সম্ভবত। এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরেই কর্নেলের সাড়া পেলাম। চাপা স্বরে ডাকলেন—জয়ন্ত!

সাড়া দিলাম।—এখানে আছি।

কাছে এসে কর্নেল হাসিমুখে বললেন—ওরা আর এখানে আসছে না। তুমি টর্চ জ্বেলে রাখো জয়ন্ত! আমি দেখি, পেতলের নলটা পাই নাকি!

এখানকার মাটি নরম। একটু খুঁড়তেই শাবলের ঘা কোনও ধাতব জিনিসে লেগে ঠং করে শব্দ হলো। তারপর কর্নেল পাথরটার তলা থেকে ফুটখানেক লম্বা একটা নল বের করলেন। নলটার ব্যাসার্ধ প্রায় দু'ইঞ্চি। নলটা থেকে মাটি পরিষ্কার করে কর্নেল তাঁর পিঠের কিটব্যাগে চালান করে বললেন—কুইক। কেটে পড়া যাক। সোজা একেবারে বাংলোতে।...

বাংলোর বারান্দায় বড্ড হিম। ঘরে বসে কফি পান করতে করতে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলাম—সকালে মল্লযুদ্ধ দর্শনের মতো এই ঘটনাও কি আকস্মিক?

কর্নেল হাসলেন।—নাঃ! দুপুরে ড্যামের রাস্তা দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটেছিলাম। প্রচুর হাঁস, সারস, একজোড়া গগনভেড় পাখিরও ছবি তুলেছিলাম। ফিল্মের রোলটা শেষ করে ফেলার ইচ্ছে ছিল। কেন ছিল তা আশা করি বুঝতে পারছ।

—মল্লযুদ্ধের যোদ্ধাদের ছবি প্রিন্ট করা।

—ঠিক। অবশ্য তুমি তার আগেই কুকীর্তি করে বসে আছ।

—কুকীর্তি কী বলছেন? আপনার কোনও উদ্দেশ্য থাকলে কাজটা একধাপ এগিয়ে দিয়েছি।

—নাঃ। আমি এখানে নীল সারসের ছবি তুলতেই এসেছি। কিন্তু আমার বরাত জয়ন্ত! যেখানে যাই, এই রকম গোলমেলে ঘটনায়

জড়িয়ে পড়ি।

—আপনি যা বলছিলেন, তাই বলুন। মানে, জাহান খাঁর কেল্লাবাড়িতে অভিযানের ব্যাপারটা।

কর্নেল উঠে গিয়ে পর্দা তুলে বারান্দার দু'দিক দেখে এলেন। তারপর ইজিচেয়ারে বসে চুরুট ধরিয়ে বললেন—ফেরার পথে ড্যামের রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। কয়েকটা জেলে-নৌকো সেখানে বাঁধা ছিল। ওরা রান্না চাপিয়ে গল্প করছিল। এমন সময় দুটো লোক এসে জেলেদের কাছে মাছ কিনতে চাইল। ওরা বলল, সব মাছ ভোরবেলা চালান গেছে। মাছ কিনতে হলে ভোরবেলা এস। কথায় কথায় লোকদুটো যে চন্দ্রপুরের বাসিন্দা, তা জানতে পারলাম। তারা জেলেদের বলল—জাহাজিবাবু পাঠিয়েছেন। জেলেরা গ্রাহ্য করল না। যে-বাবুই পাঠান, এখন মাছ কোথায়? লোকদুটো হুমকি দিল—জাহাজিবাবুকে চেনো না? ইচ্ছে করলে উনি সব নৌকো ডুবিয়ে দেবেন! জেলেদের সঙ্গে এইসব তর্কাতর্কি চলছে, আমি তখনও তো জাহাজিবাবুকে চিনি না। বাইনোকুলারে আকাশ থেকে ধনুকের মতো বেঁকে নেমে আসা হিমালয়ের হাঁস দেখছি। প্যান্ট-সোয়েটার পরা লোকদুটো সিগারেট ধরিয়ে কথা বলতে বলতে চলে গেল। আমাকে তারা গ্রাহ্য করেনি। কারণ আমার মতো অনেক ট্যুরিস্ট এ সময় ড্যামের জলে পাখি দেখতে বা বোটে রোয়িং করতে আসে।

কর্নেল একদমে কথাগুলো বলে চুপ করলেন। বললাম—তারপর?

—আমার পিছন দিয়ে যাবার সময় কানে এল ওদের টুকরো-টুকরো কথা। এখন নয়...কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে সাঁওতালরা আসে। ...রমজান পাখাড়ু? হ্যাঁ, ও বেটা বড্ড সেয়ানা।...দেউড়ির কাছাকাছি... হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবু ঢ্যারা দেগে রেখেছে। আমি চিনি।...শাবল চাই বৈকি।...পাঁচটার মধ্যেই আসবে কিন্তু। আমি থাকব।...ওদের এইসব কথা আমার কানে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল উত্তরের বাতাস। আমি দক্ষিণে। ওরা চলেছে উত্তরে। এই বাংলোর দিকে।

বলে কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। দাঁতের ফাঁকে চুরুট। আমি সেই পিতলের নলটা দেখার জন্য উসখুস করছিলাম। বললাম—কিন্তু পেতলের নলে কী আছে দেখছেন না কেন?

কর্নেল চোখ বুজেই বললেন—বাংলোয় ফিরে তোমার কাছে জাহাজিবাবুর নামধাম পরিচয় পেলাম। কাজেই কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে না গিয়ে পারিনি। এবং আমার অভিযান সফলও হয়েছে!

—আহা, নলটা!

—এখন নয়। ডিনারের পর।

—ঠিক আছে। কিন্তু সেই লোকদুটোই কি পাথরের স্ল্যাব খুঁড়ছিল?

—বোকার মতো প্রশ্ন হলো, ডার্লিং!

—মানে, আপনি সিওর কি না জানতে চাইছিলাম।

—আজ রাতে ক্যামেরা থেকে ফিল্ম রোলটা বের করে প্রিন্ট করে ফেলব। তুমি লক্ষ করোনি, টর্চের আলো জ্বালবার সঙ্গে-সঙ্গে ক্যামেরার শাটার অটোমেটিক করে রেখেছিলাম। তিন মিনিট সময় দেওয়া ছিল। কাজেই ওরা খুঁড়ে নলটা বের করার আগেই

গর্জন করে উঠলেন—কোন ব্যাটা রে?

আমাকে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের চার্জ করতে হয়েছিল।

—বলেন কী! ওদের ফোটোও তাহলে উঠেছে!

—ওঠার কথা। দেখা যাক।

—কিন্তু কর্নেল, আপনার গলা থেকে পেটের কাছে যে ক্যামেরা ঝুলছে, উঠে দাঁড়ানোর সময় তার লেন্স অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে এবার তাকালেন।—তুমি সাংবাদিক হলে কী করে জানি না। এতকাল ধরে তুমি আমার সঙ্গী। ক্যামেরাটা লক্ষ করোনি। এই দেখ ক্যামেরার পিছনে একটা ক্লিপ। ওটা আমার প্যান্টের বেল্টের সঙ্গে আটকে দিলেই ক্যামেরার লেন্স সোজা থাকবে।

হাসতে হাসতে বললাম—এও কি আপনার সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া?

কর্নেলও হাসলেন।—নাঃ! যে প্রজাপতি জাল দিয়ে ধরতে যাচ্ছি, এক হাতে তার দিকে ক্যামেরা তাক করে শাটার টেপার অসুবিধে আছে। তার চেয়ে কোমরে ক্যামেরা আঁটা থাকলে প্রজাপতিটা জালে না ধরা পড়ুক, তার ছবিটা পেয়ে যাব।...

ঠাণ্ডা ক্রমশ বাড়ছিল। তাই নিয়মভঙ্গ করে কর্নেল রাত্রি সাড়ে নটায় এই ঘরেই ডিনার পাঠাতে বলেছিলেন। নরু ঠাকুর আর ভৈরব দুটো ট্রেতে গরম লুচি, আলুর দম আর মুর্গির মাংস রেখে গেল। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন—রমেনবাবু কী করছেন?

ভৈরব বলল—ম্যানেজারবাবুর স্যার ঠাণ্ডার ধাত। তাই এত রাতে বাইরে বেরোন না।

নরু ঠাকুর বলল—ওতেই হবে তো স্যার? নাকি আরও একডজন লুচি ভেজে আনব?

কর্নেল হাসলেন।—আমার চেহারা দেখে ঠাকুরমশাই ভাবছেন, আমি লুচির পাহাড় গিলতে পারি? এই যথেষ্ট। আপনারা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন। এঁটো থালাবাটি সকালে নিয়ে গেলেই চলবে।

নরু ঠাকুর চলে গেল। ভৈরবকে ডেকে কর্নেল বললেন—তোমাদের বাংলোয় গার্ড নেই?

ভৈরব বলল—দুজন দারোয়ান আছে। পালা করে ডিউটি দেয়। গার্ডের দরকার হয় না স্যার! এ তল্লাটে চোর-ডাকাতের ভয় নেই। যারা ড্যামে বোট চালাতে বা পাখি দেখতে আসে, তারা দিনে এসে সন্ধ্যার আগে চলে যায়।

—দুপুরে যে মাছ খেয়েছি, তা কি এই ওয়াটারড্যামের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাংলোয় গেস্ট এলে জেলেদের বলে আসি।

—আচ্ছা ভৈরব, তোমার বাড়ি কোথায়?

—চন্দ্রপুর স্যার!

—রমেনবাবু চন্দ্রপুরের এক জাহাজি-বাবুর কথা বলছিলেন! চেনো তাঁকে?

ভৈরব বাঁকা মুখে বলল—শম্ভু চৌধুরি সাংঘাতিক লোক স্যার! বছরে একবার বাড়ি আসে। কখন আসবে, তার ঠিক নেই। শুনলাম সে এ মাসে এসেছে। যখনই আসে, একটা করে মানুষ খুন হয়।

চমকে উঠেছিলাম। বললাম—সে কী! পুলিশ তাকে ধরে না?

ভৈরব বাঁকা মুখেই হাসবার চেষ্টা করল। —পুলিশ জানতে পারলে তবে তো তাকে ধরবে!

কর্নেল হাসলেন।—পুলিশ জানে না। তুমি কী করে জানতে পারো?

—আমার সন্দেহ হতো আগে। পরে দেখে আসছি, যতবার জাহাজিবাবু বাড়ি আসে ততবার এলাকার কেউ না কেউ খুন হয়। গত বছর জাহাজিবাবু এসেছিল খরার মাসে। তারপর তিতলিপুরের সন্টুবাবুর লাশ পাওয়া গিয়েছিল ড্যামের জলে। জেলেরা লাশের খবর দিয়েছিল থানায়। পুলিশ এসে লাশ তুলল। মাথার পিছনে গুলির দাগ ছিল। সন্টুবাবুও অবশ্যি ভালো লোক ছিল না। বর্ডারে চোরাচালানির কারবার করত। জোরে শ্বাস ছেড়ে ভৈরব চাপা স্বরে ফের বলল—পুলিশ স্যার দেখেও দেখে না। এ পর্যন্ত আমার হিসেবে পাঁচটা খুন হয়েছে। প্রত্যেকটা লাশের মাথার পিছনে গুলির দাগ। আমার স্যার সামান্য মাথা। ক্লাস ফোর পর্যন্ত বিদ্যা। কিন্তু কারও মাথায় কেন এই সোজা ব্যাপারটা ঢোকে না জানি না।

—তুমি কি এ কথা আর কাকেও বলেছ?

—না স্যার! আমার ঘাড়ে কটা মাথা?

—তবে আমাদের কাছে বলে ফেললে যে?

ভৈরব আড়ষ্ট মুখে হাসবার চেষ্টা করল। —ম্যানেজারবাবু বলছিল, আপনি স্যার মিলিটারি অফিসার। এতদিন পেটের ভিতরে কথাটা ঢুকে ছিল। আপনাকে বলে শান্তি পেলাম। মিলিটারি আমি কম বয়সে এই তল্লাটে কতবার দেখেছি স্যার! এখান থেকে

এ টি দেবের অভিধান

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

শব্দবোধ অভিধান ১৫০.০০

শব্দাভিধান ও সাইক্লোপিডিয়া

(বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত ও পরিশোধিত)

ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিতের বিভিন্ন শাখার নূতন পারিভাষিক শব্দ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অফিস ইত্যাদির জন্য প্রবর্তিত শব্দ ও পরিভাষা এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হয়েছে। আছে জীবন-চরিত, বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ও।

২৬০০০ শব্দের বিবিধ প্রয়োজন-সাধক অভিধান

নববিধান ৮৫.০০

(জ্যোতিভূষণ চাকী কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)

এই অভিধানের বৈশিষ্ট্য

শব্দব্যাখ্যা চলিত ভাষায় ◆ উৎস ও ব্যুৎপত্তি ◆ পদপরিচয় সন্ধিসমাসাদি জ্ঞাতব্য ◆ পদান্তর ও বিপরীত শব্দ ◆ প্রবাদ প্রবচন ◆ বিবিধ জ্ঞাতব্য ঃ স্থান বিষয় ইত্যাদির পরিচয় ◆ চরিতকথা ◆ বাংলা ধাতু পরিচয় ◆ ব্রজবুলি প্রসঙ্গ ◆ পরিভাষা ইত্যাদি

সরল অভিধান ৫০.০০

(জ্যোতিভূষণ চাকী কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)

এই অভিধানটি আদৃত হয়েছিল তার সুবহতা ও ব্যবহার্যতার জন্য। বিশেষ্য বা বিশেষণ এবং তজ্জাত শব্দগুলি পৃথক-ভাবে সন্নিবেশিত হওয়ায় এর ব্যবহার্যতা বেড়েছে।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

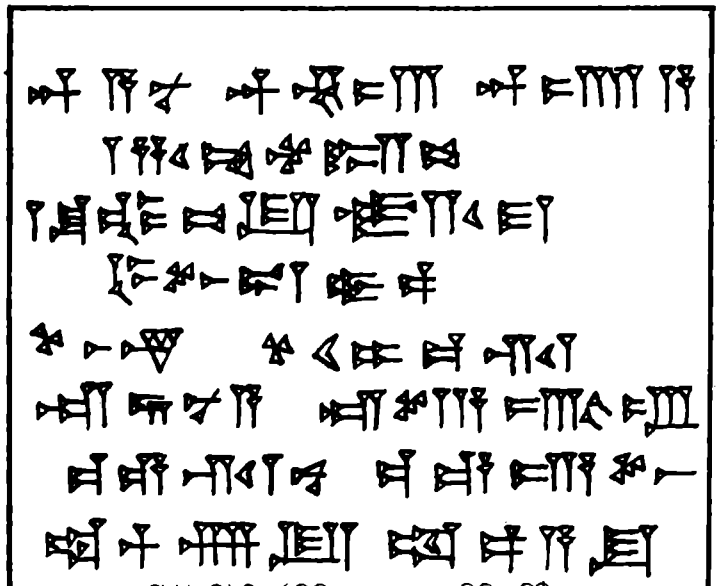

হিটাইট কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা নেকারতিতির চিঠি

পাকিস্তানের বর্ডার বেশি দূরে নয়। দু'দেশে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হলেই এই এলাকা মিলিটারিতে ভরে যেত। মিলিটারির পাওয়ার কত! স্যার! এবার যদি আবার লাশ পড়ে, আপনি দয়া করে মিলিটারি ডেকে আনবেন! জাহাজিবাবুকে জব্দ করতে আপনারাই পারবেন।

কথাগুলো শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলেই ভৈরব চলে গেল। কর্নেলের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি নির্বিকার মুখে মুর্গির ঠ্যাংয়ে কামড় দিচ্ছেন।...

রাত দশটায় চুরুট ধরিয়ে কর্নেল দরজা বন্ধ করলেন। তারপর কিটব্যাগ থেকে প্রথমে ব্রোঞ্জের ডিমালো ফলকটা বের করলেন ওটা কখন কী লোশনের সাহায্যে ব্রাশ দিয়ে ঘষে চকচকে করে ফেলেছেন। ওঁর কিটব্যাগে কী নেই? ফলকটার একপিঠে সারস এবং কয়েকরকম পাখি, তার ফাঁকে কতরকম রেখা দেখতে পেলাম। উল্টো পিঠে অন্যরকম চিহ্ন। কর্নেলের ড্রয়িং রুমে একটা বইয়ে পেরেকের মতো লিপি দেখেছিলাম। কর্নেল বলেছিলেন, এর নাম কিউনিফর্ম লিপি। কীলকাকার লিপি বলতে পারো। তবে এ লিপি তিনহাজার বছর আগে চালু ছিল। ফলকটার মাথার দিকে একটা ফুটো আছে। এটা কি গলায় ঝুলিয়ে রাখার জন্য?

কর্নেল ততক্ষণে পিতলের নলের একটা মুখ ছুরির ডগা দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছেন। একটু পরে তিনি নলের ভিতরটা আতশ কাচ দিয়ে দেখে নিলেন। তারপর একটা চিমটে দিয়ে টেনে বিবর্ণ এবং গুটিয়ে রাখা লম্বা একটা জিনিস বের করলেন। বললাম—কী ওটা?

—এটাকে বলে স্ক্রোল। প্রাচীন যুগে ভেড়া বা ছাগল জাতীয় প্রাণীর ভুঁড়ির চামড়া শুকিয়ে একরকম কাগজ তৈরি করা হতো। এতে কালো কালিতে কিছু লেখার পর গুটিয়ে রাখা হতো। তাই ইংরেজিতে একে বলা হয় স্ক্রোল।

তিনি স্ক্রোলটা সাবধানে মেলে ধরে বললেন—কিউনিফর্ম লিপিতে কিছু লেখা আছে। কলকাতা না গেলে এর পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়।

এই সময় বাইরে নাইটগার্ডের চিৎকার শোনা গেল।—চোর! চোর! ভৈরবদা! ভৈরবদা! চোর! চোর!

কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। আমিও দরজার কাছে পর্দা সরিয়ে দাঁড়ালাম। চিৎকারটা উত্তরে বাউন্ডারি পাঁচিলের দিকে শোনা যাচ্ছিল। পাঁচিলে কাঁটাতারের বেড়া বসানো আছে। ভৈরবের হাসি শুনতে পেলাম। সে বলছে—ছিঁচকে চোর! টর্চের আলোয় মুখটা চেনাচেনা লাগল। ব্যাটা ড্যামের ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপ দিলে মজাটা টের পেত।.....

ছবিঃ বিজন কর্মকার

বিশ্ব বিচিত্রা

বিশ্বের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত

মনতোষ মিশ্র

নবম শতাব্দীতে জাপানের 'KIM GAO' গানটি বিশ্বের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত বলা হয়ে থাকে। 'GOD SAVE THE QUEEN' ব্রিটিশদের জাতীয় সঙ্গীতটি লিখেছিলেন JOHN BULL (১৫৬২-১৬২৮)। এর প্রচলন হয় ১৭৪৫ সালে। FRANCIS SCOTT KEY ১৮১৪ সালে লিখেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত 'STAR SPANGLED BANNER'। গানটি ১৯৩১ সালে স্বীকৃতি পায় জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে। বিখ্যাত সঙ্গীতকার FRANZ JOSEPH HAYON (১৭৩২-১৮০৯)-এর সুরে জার্মানীর জাতীয় সঙ্গীত DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND UBERALLES রচিত হয় অস্ট্রিয়ার জাতীয় সঙ্গীত EMPEROR'S HYMN অনুসরণে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জনগণমন অধিনায়ক' ১৯৫০ সাল থেকে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত।

দারোগার গোঁফচুরি

রণজিৎ মিত্র

জগা সিঁধেলের সঙ্গে গোপী দারোগার লুকোচুরি খেলা। গোপী যদি চলেন ডালে ডালে, জগা যায় পাতায় পাতায়। হরেক কিসিম করেও দারোগা ছিঁচকে চোরটাকে ধরতে পারেন না। জগার এমন ফিচেল বুদ্ধি যে, কোন ফাঁকে সুড়ুৎ করে সে পালায় কেউ টেরটিও পায় না। চিংড়িপোতা থানায় আসা ইস্তক দারোগার রাতের ঘুম গেছে। এখন সকাল হলেই লোকের থানায় নালিশ। কার খোঁয়াড় থেকে হাঁস-মুরগি চুরি গেছে, কার গাছ থেকে কলার কাঁদি নামিয়েছে, কোন গেরস্তের রান্নাঘর থেকে বাসন-কোসন খোয়া গেছে—কি, জানালার শিক গলিয়ে আলনা থেকে কাপড়-চোপড় তুলে নিয়েছে—নানা বৃত্তান্ত।

আগে কচুকাটা থানায় গোপী দারোগা ছিলেন সুখে। সেখানে তিনি ছিলেন মুকুটহীন রাজা। তাঁর রাজত্বে বড় রকমের ডাকাতি দূরের কথা, একটা ছিঁচকে চুরিও হয়নি। সেখানের চোর-ডাকাতগুলো এত ভাল ছিল যে, রাতে নিজেরাও ঘুমোত আর থানাটাও ঘুমপুরী হয়ে থাকত। আহা, সে সব দিন কত সুখেরই না ছিল!

গোপী চক্কোত্তি ডাকসাইটে দারোগা। টানা আঠারো বছর চোর ঠেঙিয়ে এসেছেন। তাঁর চেহারাও ভয়ঙ্কর। খাড়া ছ' ফুট লম্বা, কালো আবলুশ রঙ, ইয়া বুকের ছাতি। দারোগার মুগুরের মতো লোমশ হাত—দুরমুশের মতো পা। বড় বড় চোখ, থ্যাবড়া নাক। দশনীয় বলতে তাঁর টাঙ্গি গোঁফ। নাকের নিচে এক বিঘত জায়গা জুড়ে পুরু গোঁফের বিস্তার। রোজ সকালে তিনি গোঁফের দুই প্রান্ত মোম দিয়ে চুমরে চুমরে বর্শার ফলার মতো তীক্ষ্ণ করেন। লোকে বলে, গোপী দারোগার গোঁফেই নাকি সব এনার্জি। বার বার গোঁফ চুমরে তাই তিনি এনার্জি চার্জ করেন।

সেদিন সাত সকালে ধূর্জটি ঘোষাল থানায় এসে নালিশ জানায়। রাতে তার গোলা থেকে এক বস্তা ধান চুরি গেছে। তা শুনে দারোগা গোঁফ চুমরে সেপাইদের হুকুম দেন, জলদি জগাকে ধরে আন।

চিংড়িপোতা গ্রামের শেষ প্রান্তে জগা নাপিতের বাস। মাটির দেয়াল, খড়ের চাল, জরাজীর্ণ দু' কুঠরি ঘর। জগা ছেলে-পুলে নিয়ে ঘুমোচ্ছিল। সেপাইরা তার ঘর দাপিয়ে তন্ন-তন্ন খুঁজে ধানের বস্তা দূরে থাক, এক মুঠো ধানও পায় না। ঘুম ভাঙিয়ে জগাকে সেপাইরা হিড়হিড় করে টানতে টানতে থানায় নিয়ে আসে।

জগাকে দেখে গোপী দারোগা গোঁফ চুমরে টেবিলে রুলের বাড়ি ঠোকেন, ঘোষালদের গোলা থেকে এক বস্তা ধান কোথায় গায়েব করেছিস?

শুনে জগা আকাশ থেকে পড়ে।—ধান? কি বলছেন হুজুর? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

জগার পিঠে দুম করে একটা রুলের ঘা কষিয়ে দারোগাবাবু বলেন, বুঝতে পারছিস না, ন্যাকা! ভাল চাস তো বল, ধানের বস্তাটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস? মার খেয়েও জগার মুখে হাসি। বলে, আমি গরিব মানুষ, দু'বেলা পেটপুরে খেতে পাই না। আমার এই হাড় জিরজিরে শরীরে কি দু'মণ ধানের বস্তা তুলতে পারি হুজুর?

কথাটা মিথ্যে নয়। জগা নাপিতের বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। কঙ্কালসার চেহারা। ছেঁড়া গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে বুকের হাড়পাঁজরা দেখা যায়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে হাঁটু অব্দি ময়লা খাটো ধুতি। গোপী দারোগা তার দিকে চেয়ে ধমক দেন, জগা, ছিঁচকে চুরি-চামারি করে ভেবেছিস তুই বড় সেয়ানা। কিন্তু আমার ঘর থেকে কিছু হাতাতে পারলে বুঝব তোর বুকের পাটা।

দারোগার কথায় জগা জিব কাটে।—ছি হুজুর, আপনার ঘরে চুরি করব আমি? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা?

গোপী দারোগা ব্যাটন উঁচিয়ে সতর্ক করেন, যা ব্যাটা, এবারের মতো ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আর যদি চুরি করিস তো তোকে আস্ত রাখব না। জগা নাপিত দারোগাকে আভূমি পেন্নাম করে ছুটে থানা থেকে বেরিয়ে আসে।

চিংড়িপোতা থানার পাশেই বিধু ডাক্তারের চেম্বার। সন্ধ্যেবেলায় সেখানে রোজ দাবার আসর বসে। গোপী দারোগা চৌকস

নাপতেটা কী সাংঘাতিক!

দাবাড়ু। সেদিন খেলার ফাঁকে দারোগা জগার প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, সকালেই ওকে বলেছি যদি আমার ঘর থেকে কিছু চুরি করতে পারিস তো বুঝব তোর এলেম।

দারোগার কথা শুনে বিধু ডাক্তার গম্ভীর হন।—কাজটা আপনি ভাল করেননি দারোগাবাবু। জগাকে এমন চ্যালেঞ্জ করাটা আপনার ঠিক হয়নি। কথায় আছে—নরানাং নাপিতঃ ধূর্তঃ। ওর এমন ফিচেল বুদ্ধি যে, নয়কে হয় করতে পারে।

বিধু ডাক্তার এ অঞ্চলের প্রবীণ লোক। তাঁর মুখে একথা শুনে দারোগার কপালে ভাঁজ পড়ে। সেদিন আর খেলা জমল না। কয়েকটা ভুল-ভাল চাল দিয়ে কিস্তিমাত হয়ে গোপী দারোগা বাসায় ফেরেন।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, দিন দুই যেতে না যেতে চুরি ধরা পড়ল খোদ দারোগাবাবুর ঘরে। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুতে গিয়ে দারোগা দেখেন তাঁর একদিকের গোঁফ নেই। দীর্ঘ দিনের সযত্নে লালিত টাঙ্গির মতো গোঁফের একটা ফলা কে মুড়িয়ে কেটে দিয়েছে। তা দেখে দারোগা 'হায় হায়' আর্তনাদ করে উঠলেন। চিৎকার শুনে রান্নাঘর থেকে দামিনী ছুটে আসেন, কী, কী হলো কি? বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে? কথাগুলো বলেই স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তিনি হেসেই খুন! কারণ, ওই বিদকুটে পালোয়ানমার্কা গোঁফ দামিনী দু' চক্ষে দেখতে পারেন না। এই গোঁফ রাখা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কতদিন কথা কাটাকাটি। গোপী দারোগার এক কথা, শিকারী বেড়ালকে যেমন গোঁফে চেনা যায়, তেমনি পুরুষ চেনা যায় গোঁফে। তাই নিজের পৌরুষ জাহির করতে তিনি সগর্বে এতকাল গোঁফ পুষেছেন। সেই সাধের গোঁফ খোয়া যেতেই দারোগাবাবুর মাথায় বাজ। আরো আশ্চর্যের কথা, তাঁর নাকের ডগায় এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল অথচ তিনি টের পেলেন না? রাত্রে স্বামীর বীভৎস নাক ডাকায় ঘুম হয় না বলে দামিনী অন্য ঘরে ঘুমোন। এখন গ্রীষ্মকাল। গরমে গোপী দারোগা ঘরের সব জানালা খোলা রেখেই ঘুমিয়েছিলেন। আর চোর ব্যাটা সেই সুযোগে জানালার শিক বেঁকিয়ে তাঁর আধটা গোঁফ লোপাট করে দিয়ে গেছে।

হাসতে হাসতে দামিনী জিগ্যেস করেন, তোমার এ দশা কে করল গো? শুনে দারোগার মেজাজ যায় চড়ে। বার দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি মুখে তোয়ালে চাপা দিয়ে হাঁক পাড়েন, এই রামধন, জগদীশ, জলদি আ যাও। জগা ডাকুকো আভি পাকড়ে লে আও—

দারোগাবাবুর হুকুম তামিল করতে দু'জন সেপাই ছুটল জগা নাপিতকে ধরতে। মুখে আঁচল ঢাকা দিয়ে দামিনীও ঢোকেন রান্নাঘরে।

বিধু ডাক্তার চেম্বারে বসে রোগী দেখছিলেন। দারোগার চিৎকার শুনে রোগী ফেলে তিনিও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। —কী, কী ব্যাপার দারোগাবাবু, সাত সকালে এত হাঁকডাক?

গোপী দারোগা মুখ থেকে তোয়ালে সরিয়ে অস্ফুটস্বরে বলেন, দেখুন, ব্যাটা কি করেছে? তা দেখে, বিধু ডাক্তার ফিক করে হেসে ফেললেন, ইশ, এ যে গোঁফচুরি!

—এ হলো ওই জগা সিঁধেলের কাজ! দারোগা তড়পাতে থাকেন, দাঁড়ান না, আমিও গোপী চক্কোত্তি। এই গোঁফচুরির দায়ে ব্যাটাকে এমন সাজা দেব যে—

—দারোগাবাবু, আমি আগেই বলেছিলাম জগাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে আপনি ভাল করেননি। এখন তো বুঝতে পারছেন নাপতেটা কী সাংঘাতিক!

বিধু ডাক্তারের কথায় দারোগার রাগ আরো বেড়ে যায়। তিনি দুদ্দুড় পায়ে ঘরে ছোটেন। মুহূর্ত পরেই ফিরে আসেন। হাতে কাঁচি কাটা একফালা গোঁফ!

—এই দেখুন ডাক্তারবাবু, গোঁফটা কেটে ব্যাটা টেবিলের ওপর রেখে গেছে। গোঁফ-শোকাতুর দারোগার গলা ঠেলে কান্না আসে, আহা, আমার এত সাধের গোঁফ—

বিধু ডাক্তার রসিক লোক। তিনি বলেন, মশায়, ছোটবেলায় আমরা সুকুমার রায়ের 'গোঁফচুরি' ছড়া পড়েছিলাম। তাতে অফিসের বড়বাবু স্বপ্নে দেখেছিল তার গোঁফ চুরি গেছে। কিন্তু এ যে সত্যি সত্যি—

দামিনী এসে স্বামীকে সান্ত্বনা দেন। বলেন, যাক গে, আপদ গেছে। এখন একটা নাপিত ডেকে বাকি আধখানাও কামিয়ে ফেল, নইলে

দেখতে বিতিকিচ্ছিরি লাগছে।

—কী, আমি বাকি গোঁফটা কামিয়ে ফেলব? দারোগার গলায় আর্তনাদ।

—নয়তো কি, একদিকের গোঁফ নিয়ে থাকবে? পরিহাসের সুরে দামিনী জের টানেন, আর বল তো, ফেবিকল এনে দিই। ফেবিকলে তো কাটাছেঁড়া জিনিস জোড়া দেয়—টি.ভি.-তে দেখনি?

এমন সময় সেপাই দু'জন নেংটি ইঁদুর ধরার মতো জগাকে হিড়হিড় করে টেনে আনে। তাকে দেখে গোপী দারোগা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন।—ব্যাটা, তোর এত সাহস আমার গোঁফ কেটেছিস? বলেই সেপাইয়ের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে দারোগা জগার পিঠে দুম-দুম দু' ঘা বসিয়ে দেন। রাগে গরগর করতে করতে বলেন, দাঁড়া বজ্জাত, গোঁফচুরির সাজা কি হাড়ে-হাড়ে তা বুঝবি। তোকে পাক্কা দু' বছর জেলের ঘানি টানিয়ে ছাড়ব।

দারোগার শাসানিতে জগা গিয়ে দামিনীর পায়ে পড়ে।—হেই গিন্নিমা, আপনি আমাকে বাঁচান। আমি দারোগাবাবুর গোঁফ কাটিনি। অন্য কেউ হয়তো কেটেছে।

জগার আত্মসমর্পণে দামিনী খুশি হন। তিনি বাঘা উকিলের মেয়ে। জগার পক্ষে তিনি সওয়াল শুরু করেন। স্বামীকে বলেন, জগা যে তোমার গোঁফ কেটেছে তার প্রমাণ কি?

প্রমাণ? দারোগা হাতের আধখানা গোঁফ তুলে ধরে বলেন, এই তো প্রমাণ!

দামিনী বাঁকা হাসি হাসেন।—উঁহু, কোর্টে কেস উঠলে এ প্রমাণ টিকবে না। কাটা গোঁফের ফিংগার প্রিন্ট করে তাতে জগার হাতের ছাপ আছে কিনা—তা দেখে ওকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে, তার আগে নয়।

স্ত্রীর যুক্তি শুনে দারোগা তো থ। অভ্যাসবশে তিনি এনার্জি চার্জ করতে ডানপাশের গোঁফ চুমরে বাঁদিকে হাত বোলাতে গিয়ে দেখেন জায়গাটা ফাঁকা। বাকি আধখানা গোঁফ তাঁর হাতেই ধরা। অমনি দারোগার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। স্ত্রীর জেরায় জেরবার হয়ে তিনি হুঙ্কার ছাড়েন, আমিও তিন-তিনটে সাক্ষী কোর্টে তুলে প্রমাণ করে দেব যে, জগাকে তারা গোঁফ কাটতে দেখেছে।

স্বামীর কথায় দামিনীর মুখে ব্যঙ্গের হাসি, হুঃ, এই না হলে দারোগার বুদ্ধি! বলি, এতে তো তুমি নিজেই যাবে ফেঁসে। কোর্ট যখন চেপে ধরবে, রাতদুপুরে ওই তিনটে লোক তোমার শোবার ঘরে গেছল কেন তখন কি উত্তর দেবে? তা ছাড়া গোঁফচোরকে তারা তখনই হাতে-নাতে ধরেনি কেন—তখন কি বলবে?

পুলিশের চাকরি-জীবনে এতবড় সমস্যা কখনো হয়নি গোপী দারোগার। মনে মনে তিনিও স্বীকার করেন দামিনীর যুক্তিগুলো পুরোপুরি ঠিক। স্বামীকে চুপ থাকতে দেখে দারোগা-গিন্নি বলেন, খুন-জখম-কাটা-ছেঁড়া কেসে তো পোস্টমর্টেম হয়। তুমি কাটা গোঁফের পোস্টমর্টেম করিয়ে রিপোর্টে দেখ, ওটা ছুরি কাঁচি না ভোজালিতে কাটা?

এতক্ষণ বিধু ডাক্তার উকিল-কন্যার জেরা শুনছিলেন। তিনি চমৎকৃত হয়ে দামিনীকে সাবাস দেন, বাহবা ম্যাডাম, আপনার জবাব নেই। স্রেফ উকিলের মেয়ে হয়ে যদি এরকম কেস লড়েন, না জানি ওকালতি পড়লে কী করতেন?

দারোগা নিজের হার বুঝতে পেরে জগার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে ধমক দেন, ভাবিস না তুই রেহাই পাবি। তোর মতো গোঁফচোরকে কেমন আড়ং ধোলাই দিতে হয় তা আমি দেখাব।

স্বামীর হুমকিতে দামিনী প্রতিবাদ করেন। —ওকে গোঁফচোর বলছ কেন? ও তোমার গোঁফ কেটে থাকতে পারে কিন্তু চুরি করে নিয়ে তো যায়নি। গোঁফ তোমার ঘরের টেবিলেই রেখে গেছে, শুধু জায়গা বদল হয়েছে মাত্তর। তিনি জগার দিকে চেয়ে হেসে বলেন, আধখানা গোঁফ নিয়ে দারোগাবাবু কি সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে? যা জগা, বাকি আধখানাও খুর চালিয়ে নামিয়ে দে।

ছবি : জুরান নাথ

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রতি বছর মহালয়ার দিন একটি করে পূজাবার্ষিকী বের করত। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এই বছর থেকে মহালয়ার দিন আবার পূজাবার্ষিকী বেরুচ্ছে

তবে নতুন নয়

৪৫ বছর আগের সাড়া-জাগানো বার্ষিকী

জয়যাত্রা ৯০.০০

যাঁদের লেখা আছে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত
প্রবোধ কুমার সান্যাল
প্রেমেন্দ্র মিত্র
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সজনীকান্ত দাস
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু
আশাপূর্ণা দেবী
বনফুল
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
প্রমথনাথ বিশী
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
মনোজ বসু
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
হেমেন্দ্র কুমার রায়
সুনির্মল বসু
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নরেন্দ্র দেব
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
পি. সি. সরকার
বিধায়ক ভট্টাচার্য
পরিমল গোস্বামী
কুমুদরঞ্জন মল্লিক
শিবরাম চক্রবর্তী
এস ওয়াজেদ আলি
নবনীতা দেব
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
স্বপনবুড়ো
গজেন্দ্র কুমার মিত্র
ইন্দিরা দেবী
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
ধীরেন্দ্রলাল ধর
বিশু মুখোপাধ্যায়
এবং আরও অনেকে

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

গল্প হলেও সত্যি

তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

*[ইংরাজীতে বলে টার্নিং পয়েন্ট। বাংলায় সন্ধিকাল অর্থাৎ মানুষের জীবনের মোড় ঘুরে যাবার মুহূর্ত। জীবনে বহু ঘটনা ঘটে—নানা মানুষ, নানা সাধু বা সাধিকার জীবনে, যেগুলি সাধারণ হলেও অসাধারণ হয়ে অনেক মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। সেই রকমই কিছু ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে **গল্প হলেও সত্যি** শিরোনামে।]*

বেবী আশ্রম

তখন গভীর রাত। দারুণ শীত পড়েছে। ভাল করে গায়ে চাদর জড়িয়ে অনাথ বালকদের দেখতে এল সুরেশ। ষোল বছরের কিশোর সে। এসে দেখে ঘরের বাইরে একটি ছেলে ঠকঠক করে কাঁপছে। শীতের ভয়ে সে দু'হাত দিয়ে কানদুটো চাপা দিয়ে গুড়ি হয়ে বসে রয়েছে। সুরেশ এগিয়ে গিয়ে তাকে দাঁড় করাল। জিজ্ঞাসা করল, এত শীতে বাইরে এসেছিস কেন? ছেলেটি জানাল যে সে 'ছোটবাইরে' যেতে বেরিয়েছিল, শীতের কাঁপুনিতে আর ফিরতে পারছে না। সুরেশ বুঝল তার চাদর বা গরম জামা কিছুই নেই। এরা অনাথ, কয়েকদিন আগে অনাথ আশ্রমে এসেছে। সুরেশ তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের চাদরটা খুলে ছেলেটির গায়ে জড়িয়ে দিয়ে তাকে পৌঁছে দিল তার ঘরে।

নিজের বাসায় ফিরতে ফিরতে সুরেশের মনে হতে লাগল, ঐ ছেলেটিও হয়তো তার মতো অনেক রাত জেগে কাটিয়েছে। আগে গ্রামের চৌকিদার গভীর রাতে যখন হাঁক দিত তখনই সুরেশ জেগে উঠত। সে রাতে শোবার সময় মাকে বলত, মা, চৌকিদার যখন হাঁক দেবে আমাকে জাগিয়ে দিও। প্রথম প্রথম মা-ই তাকে জাগিয়ে দিতেন। তারপর হঠাৎ তাকে ফেলে মা চলে গেলেন পরপারে। তারপর আর কাউকে তাকে জাগিয়ে দিতে হয়নি। সে বহু রাতই জেগে কাটিয়েছে। চৌকিদারের জাগানীয়া স্বর শুনতে তার ভাল লাগে।

এমনই জীবন-জাগানীয়া কণ্ঠস্বরের প্রত্যাশায় সুরেশ অপেক্ষা করে। এমন কৌতূহলেই সুদর্শন ছেলেটি একদিন সব ছেড়ে হাজির হলো এক তেজদৃপ্ত সন্ন্যাসীর কাছে। তাঁকে জানাল সে তাঁর আশ্রয়ে থাকতে চায়। সুরেশ তরুণ। মিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী। অপূর্ব ভজন গাইতে পারে। তার গান শুনে সেই ব্যক্তি বললেন, তুই মঠে থাকতে পারবি? বাড়ির জন্য মন খারাপ করবে না? সুরেশ বলে, না। আমি আপনার কাছে দীক্ষা নেব। তিনি বললেন, হ্যাঁরে, তুই আমার জন্য ভিক্ষা করতে পারবি! সুরেশ বলে, হ্যাঁ পারব।

কথা কটি বলার সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ বেরিয়ে পড়ল ভিক্ষা করতে। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে নিজে রেঁধে সে খাওয়াল স্বামী বিবেকানন্দকে। গুরু সন্তুষ্ট হয়ে প্রিয়পাত্রকে দীক্ষা দিলেন। গুরুর নির্দেশে সুরেশ পাড়ি দিল পশ্চিমদেশে, একেবারে আমেরিকায়। বয়সে তরুণ, তবু স্বামীজীর বিশ্বাস সে ওদেশের মানুষদের মন জয় করবে।

সুরেশের মনে এতটুকুও ভয় নেই। সে তার ঈপ্সিত পুরুষের আশীর্বাদ পেয়েছে। গুরুর কৃপায় সব কাজ সে করতে পারবে। ছোটবেলা থেকেই সে গাছে উঠতে, জলে সাঁতার কাটতে ও ফুটবল খেলতে ওস্তাদ। সব বিষয়েই সে ছিল সমবয়সী বন্ধুদের দলপতি। তাই নির্ভয়ে সে হাজির হলো আমেরিকায়।

অপূর্ব বক্তৃতা দিতে লাগল সে সেখানে। মুগ্ধ জনতা তাকে দেখে বলত, আপনি দেখতেও যেমন স্বামীজীর মতো, আপনার কণ্ঠস্বরও তেমনি আপনার গুরুর মতো। শুনে আনন্দিত হয় তরুণটি। ভাবে তাহলে সে গুরুর নির্দেশে অনেক কাজ করতে পারবে এবং এদেশের লোক সেটা নেবে। তাহলে স্বামীজী খুশি হবেন।

গুরুর ইচ্ছামতো ক্যালিফোর্নিয়ায় সে গড়ে তুলল একটি আশ্রম। নাম দিল 'আনন্দ আশ্রম'। সেখানে সে শুরু করল মৌমাছির চাষ, শিল্প বিকাশ ও পুস্তক প্রকাশনা। আর রাখল হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, জরথুস্টীয়ান, তাওবাদী, কনফুসীয়ান প্রভৃতি সমস্ত ধর্মের লোকের উপাসনার ব্যবস্থা। এরপর ১৯২৯ সালে বোস্টন শহর ছাড়িয়ে দূরে আর একটি আশ্রম গড়ে তুলল সুরেশ। সে জায়গাটি ছিল ওক আর পাইন বনের মাঝে। আশ্রমটি হয়ে দাঁড়াল ধ্যান-কুটীর।

সুরেশ আশ্রমের নাম রাখল 'বেবী আশ্রম'। উঁচু পাথরখণ্ডের ওপর তৈরি হলো ছোট ছোট কুটীর।

বনের নির্জন পরিবেশ মনঃসংযোগের উপযুক্ত স্থান ভেবে সুরেশচন্দ্র নির্বাচন করেছিল জায়গাটি। সেখানে নানা ধর্মের লোক এসে তার কাছে ধর্মোপদেশ, জীবনাদর্শ ও মানবসেবার নানা কথা শুনত। সকলে বসত পাইন পাতা বিছানো জমির ওপর—ঠিক যেন ভারতের তপোবন।

একদিন আশ্রমের নিচের কুটীরে যখন তার অনুগামীরা উপস্থিত হয়েছে, সে বলল, আমি ওপরের কুটীর থেকে একটু ঘুরে আসছি, আপনারা অপেক্ষা করুন।

বেশ কিছুক্ষণ সময় গেল। উপস্থিত অতিথি-অভ্যাগতরা একটু চঞ্চল হলো।

শেষে সুরেশচন্দ্র ফিরল। বলল, আমি অন্যলোকে গিয়েছিলাম। এই বলেই সে মাটিতে পড়ে গেল। সকলে তাকে তুলতে ছুটে এল। সুরেশচন্দ্র বলল, আমাকে নাড়িও না।

স্বামীজীর স্নেহধন্য প্রিয়শিষ্য সুরেশচন্দ্র (স্বামী পরমানন্দ) সজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করলেন।

তথ্য: নবযুগের মহাপুরুষ: স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, পৃঃ ১১৮-৩২

পল্টুর উল্টো কাজ

অমিয় দত্ত

পল্টু সবার ফাইফরমাশ খাটে। কেউ কিছু করে দিতে বললে সে কখনও না বলে না। এখানে ওখানে ছুটোছুটি করতে তার মতো ওস্তাদ মেলা ভার। তাই বাড়ির লোক তো বটেই, আত্মীয়স্বজনও কিছু দরকার হলে তার শরণাপন্ন হন।

তবে এত গুণের মধ্যে একটা দোষ তার ছিল। মাঝে মাঝে দু-একটা কাজ সে এমন উল্টোপাল্টা করে বসত যে লোকেদের নাজেহালের একশেষ। কিন্তু যেহেতু সব সময় সে অঘটন ঘটাত না, তাই একটু-আধটু বিপত্তিতে পড়লেও আবার তার দ্বারস্থ হতে কেউ ইতস্তত করতেন না।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর তার মা বললেন, পল্টু, আমি কালীঘাটে মানত করেছিলাম, তুই এবার যদি পাশ করিস, তাহলে মায়ের পুজো দেব। তা, তাঁর অসীম কৃপায় তুই তো উতরে গেলি! তাই বলছি, কাল সকালে আমাকে একবার কালীঘাটে নিয়ে যাবি বাবা?

পল্টু বলল, পুজো দেবে? নো প্রবলেম।

পরদিন সকালে গলি থেকে বেরিয়ে বিবেকানন্দ রোডে পৌঁছে পল্টু একটা রিকশায় চড়ে বসল।

চোখ কপালে তুলে মা বললেন, একি? রিকশা করে তুই কালীঘাটে যাবি! একটা ট্যাক্সি নিলে হতো না?

বিরক্ত হয়ে পল্টু বলল, অত সব তোমায় চিন্তা করতে হবে না, উঠে পড় তো!

মা আর কী করেন? অগত্যা উঠে বসলেন রিকশায়।

পল্টু রিকশাওয়ালাকে হুকুম দিল, সোজা ঐ মোড়ে গিয়ে তারপর ডানদিকে চল।

অল্পক্ষণ পরে ঠনঠনের কালীবাড়ি পৌঁছতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, থাম, থাম, এখানে নামব।

মা বললেন, একি রে? এখানে কেন? তোকে বললাম না যে মানত আমার কালীঘাটের কালীর কাছে?

আরে বাবা, কালীঘাটে জাগ্রত কালী, ঠনঠনেতেও তাই। বিজ্ঞের মতো বলল পল্টু, ওখানকার পুজো, এখানে দিলেই হবে। সেই হেড অফিসের চিঠি ব্র্যাঞ্চ অফিসে দেওয়ার মতো। পৌঁছবে ঠিকই।

মা আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন ; কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সে ফের বলল, দোহাই তোমার, আর কিছু বল না। ঠনঠনের মা কালীকে এমনি করে অশ্রদ্ধা করলে বারো ক্লাসের পরীক্ষায় আমাকে নির্ঘাত গাড্ডু ঝাড়তে হবে!

এমন কথা শুনলে সবাই ভয় পায়! মাও পেলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, কালীঘাটে গিয়ে মানত করেছি বটে, কিন্তু মাকে তো বলিনি যে ওখানে গিয়ে পুজো দেব! তাছাড়া, মার নিজেরও নিশ্চয় ঠনঠনেতে পুজো নেওয়ার ইচ্ছে, তা না হলে পল্টুর মাথায়ই বা এ চিন্তা আসবে কেন?

এ কথা মনে হতে তাঁর দ্বিধা কেটে গেল। তিনি ভক্তিভরে সেখানেই তাঁর পুজো দিলেন।

আর একদিনের ঘটনা—

বিকেলবেলায় পল্টু গেল বড়পিসির বাড়িতে বেড়াতে। তাকে দেখে পিসি হাতে যেন স্বর্গ পেলেন। বললেন, তুই এসেছিস পল্টু! তোর পিসেমশায়ের পুরোনো চটিটা ছিঁড়ে গেছে, একেবারে মেরামতের বাইরে। তুই বাবা, জুতোর দোকান থেকে একটা ন' নম্বরী চটি কিনে দিয়ে যা।

ন' নম্বর? নো প্রবলেম। বলে বেরিয়ে গেল পল্টু।

এক ঘণ্টা বাদে সে ফিরে এল। হাতে পলিথিনের একটা বিরাট ব্যাগ।

ব্যাগটা নিয়ে পিসি বললেন, এত ভারী জিনিস কী আনলি রে?

খুলেই দ্যাখ না!

ব্যাগ খুলে পিসি হাঁ! এক জোড়া ন' নম্বরী গাম বুট!

তিনি বললেন, তোকে যে চটি আনতে বললাম?

আরে, এই বর্ষাকালে গাম বুটই তো ভাল! একগাল হেসে বলল পল্টু, চটিতে পিসেমশায়ের ধুতি কাদায় ছিটে লেগে নষ্ট হয়ে যাবে! তাছাড়া, রাস্তায় এখানে ওখানে জল জমলে চটি পরে হাঁটার কত অসুবিধা! ঐ নোংরা জলে পা ডোবাতে হয়? জান, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, প্লেগ এমনি কত সব মারাত্মক রোগের জীবাণু ওখানে সব সময় কিলবিল করে?

এরপর বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া পিসির আর কিছু করার রইল না!

পল্টুর জন্য তার মেজদি আর মেজ

জামাইবাবুও কম বিপাকে পড়েননি।

শনিবারের খবরের কাগজ দেখে মেজদি খুশিতে ফেটে পড়ে বললেন, আরে! সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য' দেখছি রাধায় দিয়েছে কাল দুপুর দুটোর শোতে। ছবিটা এখনও দেখা হয়নি। কবে থেকে আশা করে আছি। চল না দেখি।

জামাইবাবুরও ফিল্মটা দেখার ইচ্ছে। তাই তিনি বললেন, হ্যাঁ, চল। এক কাজ কর, পল্টুকে ফোনে বল সে যেন আজ গিয়ে দুটো টিকিট কেটে আনে। ওদের বাড়ি থেকে তো হলটা কাছেই।

তিনি না বললেও মেজদি তাই করতেন। পল্টু ছাড়া এসব কাজে আর কোনো উপযুক্ত লোক নেই। তিনি ফোন করে পল্টুকে তাঁর অনুরোধ জানালেন, আর বললেন, ভাই, তুই টিকিট দুটো দিয়ে টাকাটা নিয়ে যাস।

সিনেমার টিকিট? নো প্রবলেম। যথারীতি জবাব এল ওপাশ থেকে।

সেদিন রাতে পল্টুকে ফোন করে জানা গেল যে টিকিট কাটা হয়ে গেছে, আগামীকাল সময় মতো সে এসে দিয়ে যাবে।

রবিবার সকালে পল্টু এল না। বারোটায় খাওয়া শেষ হলো। ওবাড়িতে একবার ফোন করা হলো। মা বললেন, পল্টু তো সেই এগারটায় খেয়ে বেরিয়ে গেছে। বলে গেল যে এক বন্ধুর বাড়ি হয়ে তোর ওখানে যাবে! তা, এখনও যায়নি?

তাই বলে গেছে? তা হলে ঠিক আছে।

কিন্তু একটায় যখন সাজগোজ শেষ হলো তখনও পল্টুর দেখা নেই।

দেড়টাতেও যখন সে এল না, তখন সত্যিই দুশ্চিন্তার কথা! মাকে আবার ফোন! কিন্তু কোনো খবর নেই।

দুটো বাজলে তাঁরা পল্টুর আশা ছেড়েই দিলেন। নতুন ধরনের দুশ্চিন্তা আনাগোনা করতে লাগল তাঁদের মনে। পল্টুর কিছু হয়নি তো? কলকাতায় আজকাল যা অবস্থা!

না, পল্টুর কিছু হয়নি। সে এসে হাজির হলো সওয়া দুটোয়।

জামাইবাবু খুবই বিরক্ত হলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা বললেন না।

দিদি চেঁচিয়ে উঠলেন, এতক্ষণে তোর সময় হলো? সিনেমা দুটোয় আরম্ভ, আর তুই এলি সওয়া দুটোয়? আমরা যখন পৌঁছাব, তখন ছবিটার আর কি কিছু বাকি

থাকবে?

মেজদির চেঁচামেচি কিছুমাত্র বিচলিত করল না পল্টুকে। সে একগাল হেসে বলল, আরে, কাল তোমার 'জন অরণ্যের' টিকিট কাটতে গিয়ে রাস্তায় দেখা হলো আমার বন্ধু ভল্টুর সঙ্গে। সে বলল যে 'জন অরণ্য' একটা সাদামাঠা বই। ওর মধ্যে জবরদস্ত সাসপেন্স, রোমাঞ্চ, ভয় এসবের কিছু নেই। কী হবে ওটা দেখে? ভল্টুই বলল যে এলিটের বইটা দারুণ হিট করেছে—'কিলারস অ্যাট লার্জ'! চলে গেলাম সেখানে। কী ভিড়! কোনো রকমে দুখানা ফ্রন্ট সার্কলের টিকিট পাওয়া গেছে। তিনটেয় আরম্ভ। আসল বই শুরু হবে তিনটে পঁয়ত্রিশে। হাতে অনেক সময় আছে। তাছাড়া, তোমাদের এই তালতলার বাড়ি থেকে তো খুব কাছেই।

মেজদি কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জামাইবাবু বললেন, সত্যি শালাবাবু, তোমার কোনো তুলনা নেই! দাও টিকিট দুটো।

এটা জামাইবাবুর রাগের কথা না প্রশংসা তা পল্টু বুঝতে পারল না।

সেদিন এলিটে গিয়ে মেজদির দুর্ভোগের আর শেষ নেই। প্রথমত সাহেব-মেমের ঐ জড়ানো ইংরেজি কথা তিনি একেবারেই বুঝতে পারেন না, তার ওপর রক্ত, রক্ত, আর রক্ত! ভয়ে আর বিতৃষ্ণায় তাঁর মন ভরে গেল। জামাইবাবুর অবস্থাও হলো শোচনীয়!

পল্টুর এ সব কীর্তি তো ছোটখাট ব্যাপার! বড়দি আর বড় জামাইবাবুর বেলায় যা ঘটেছিল, তার কাছে এগুলো সত্যিই নস্যি।

এক শুক্রবারে বড়দি ফোন করলেন। বললেন, ভাই পল্টু, তোর জামাইবাবুর সঙ্গে আমি কাল দিল্লী যাচ্ছি। সন্ধ্যা সওয়া সাতটায় ফ্লাইট। ফিরব বৃহস্পতিবারে। মলিকে দেখাশোনার জন্য বড়পিসিমা কাল থেকে এখানে এসে থাকবেন। স্কুলের দিনে তো মলির কোনো অসুবিধা হবে না, ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো করবে, আর সন্ধ্যেটা টিউটরের কাছে কেটে যাবে পড়া করতেই। কিন্তু ছুটির দিনটায় তার একা লাগবে। তুই পরশু রবিবারে এসে তাকে যদি একটু সঙ্গ দিস, পার্কে-টার্কে নিয়ে যাস, তাহলে খুব ভাল হয়। পল্টুমামাকে পেলে সে খুব খুশি হবে।

পল্টু বলল, মলিকে সঙ্গ দিতে হবে? নো প্রবলেম।

পরদিন অর্থাৎ শনিবার দুপুরে মলি আর স্কুল থেকে ফেরে না! ঐদিন ছুটি সাড়ে বারোটায়। বাড়ির কাছেই স্কুল। হেঁটে আসতে দেরি লাগার কথা নয়। অন্য শনিবার সে একটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যায়। আজ দুটো বাজল তবু তার দেখা নেই!

ততক্ষণে বড়পিসি এসে গেছেন। মলি না আসায় তিনি এবং মলির মা দুজনে খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন স্কুলেই কোনো কারণে দেরি হচ্ছে। কিন্তু আড়াইটের মধ্যেও সে না আসাতে মাকে যেতে হলো স্কুলে। সেখানে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল স্কুলে কেউ নেই, সব ঘরে তালা লাগানো হয়ে গেছে।

মলির মা তখনই ছুটলেন অপর্ণার বাড়ি। সে মলির বান্ধবী। কাছেই থাকে।

অপর্ণা যা বলল তাতে তিনি খুব ভয় পেয়ে গেলেন। সে দেখেছে ছুটির পর একটা কালো অ্যামবাস্যাডর গাড়ি মলিকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গেছে। সে একটু পিছনে ছিল বলে ভিতরে ক'জন ছিল তা দেখতে পায়নি।

এটা সত্যিই চিন্তার কথা! কালো অ্যামবাস্যাডর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কারও নেই। মার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। নির্ঘাত মলিকে ছেলেধরা নিয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে ফিরলেন তিনি।

ততক্ষণে মলির বাবা এসে গেছেন। পিসির কাছে শুনে তিনিও খুব চিন্তিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন স্ত্রীর জন্য। মলিকে পাওয়া যায়নি শুনে তিনি ফোনে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খোঁজ করলেন। যদিও দুরাশা, তবু যদি কিছু খবর মেলে।

কোথাও মলির খোঁজ পাওয়া গেল না। পল্টুর কথা জিজ্ঞাসা করতে শাশুড়ি মা বললেন, আজ সাড়ে দশটায় সে বেরিয়ে গেছে, আর ফেরেনি।

ক্রমে ক্রমে এগিয়ে চলল সময়। ছটা বাজল, সাতটা বাজল, তবু মলি এল না। দিল্লী যাওয়া বানচাল হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আত্মীয়রা এসে হাজির হলেন।

সবার সঙ্গে পরামর্শ করে মলির বাবা সাতটায় থানায় গিয়ে ডায়েরি করে এলেন।

বাড়িতে তখন বিষাদের ছায়া, কান্নাকাটি। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

অবশেষে রাত নটার সময় সবাইকে চমকে দিয়ে স্কুলের ব্যাগ হাতে খুশি মনে মলি এসে ঢুকল বাড়িতে।

হৈচৈ, হুলুস্থুল পড়ে গেল সেখানে। মা গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

এত লোক সমাগম দেখে মলি অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, একি, তোমরা সবাই এসেছ? মা, বাবা, তোমরা দিল্লী যাওনি?

বাবা বললেন, না, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

আজ খুব মজা হয়েছে বাবা। পল্টুমামার বন্ধু গণেশমামাদের গাড়িতে আমি, গণেশমামা, পল্টুমামা আর ড্রাইভার রামদীনকাকা কত জায়গায় ঘুরলাম! প্রথমে একটা বড় রেস্টুরেন্টে খেলাম, তারপর গেলাম চিড়িয়াখানায়, তারপর সিনেমা। কী মজা।

পল্টুকে তার বড়দি রবিবারে মলিকে সঙ্গ দিতে বলেছিলেন, কিন্তু সে যে শনিবারে এই কাণ্ড করে বসবে তা তিনি কল্পনা করেননি। রাগত স্বরে মলিকে প্রশ্ন করলেন তিনি, পল্টুমামা কোথায়?

আমাকে ঐ গলির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল।

তোমাকে কোথায় পেল তোমার পল্টুমামা?

কেন? পল্টুমামা, গণেশমামা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের স্কুলের কাছে। ছুটি হলে আমি যখন বাড়ি আসছিলাম, তখন পল্টুমামা আমাকে এসে বলল, চিড়িয়াখানায় যাবি তো উঠে পড় গাড়িতে। রেস্টুরেন্টে খাবি, সিনেমা দেখবি, কত মজা হবে।

পল্টুর দায়িত্বহীনতার সমালোচনায় সবাই সোচ্চার হয়ে উঠল। বড়দি তো রেগে টং। তাঁদের এত চিন্তা-ভাবনা, থানা-পুলিশ সব কিছুর জন্য ঐ ছেলেটা দায়ী। তার ওপর সে তাঁদের দিল্লী যাওয়া বন্ধ করে তাঁর নিজের বেড়ানো, আর স্বামীর ব্যবসার ক্ষতি করে দিয়েছে। টিকিটের টাকারও লোকসান। তিনি স্থির করলেন আজ রাতে আর কিছু বলবেন না; তবে কাল সকালে ফোনে একবার তাকে দেখে নেবেন।

কিন্তু পল্টুকে দেখে নেওয়া আর হলো না, কারণ পরদিন সকালে তাকে ফোন করার আগেই তাঁরা খবরের কাগজে দেখলেন এই সংবাদ—

কলকাতা-দিল্লী সান্ধ্য ফ্লাইটের প্লেন আগুন লাগিয়া পাটনায় অবতরণে বাধ্য। যাত্রীদের যাবতীয় জিনিসপত্র সমেত প্লেনটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। অলৌকিকভাবে সকলের প্রাণ রক্ষা। উদ্ধারকালে কয়েকজন আহত। সারারাত্রি যাত্রীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ।

পল্টুর জন্য তার বড়দি আর জামাইবাবু যে শুধু এই দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছেন তাই নয়, ব্যবসার জরুরি কাগজপত্র আর সত্তর হাজার টাকাও নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে।

তাই, দেখে নেওয়ার বদলে বড়দি তাকে ফোনে বললেন, ভাই, এখনই তুই এ বাড়িতে চলে আয়। তুই যা খেতে পছন্দ করিস সব কিছু তোর জামাইবাবু আজ বাজার থেকে নিয়ে এসেছেন। তোর জন্য রাঁধছি দেরাদুন চালের ঘিভাত, ভেটকি মাছের ফ্রাই, কিমা দিয়ে পটলের দোরমা, বড় বড় বাগদা চিংড়ির মালাইকারি, চিতল পেটির ঝাল, মোরগ মসল্লম, আমসত্ত্ব আর খেজুর দিয়ে টমেটোর চাটনি, জমাট দই, রাবড়ি আর সন্দেশ।

ওদিক থেকে খুশির আওয়াজ এল, এক্ষুণি যাচ্ছি। নো প্রবলেম।

ছবি : প্রীতিশ ব্যানার্জী

সুনির্মল বসুর জন্মশতবর্ষে
দেব সাহিত্য কুটীরের শ্রদ্ধার্ঘ্য

সুনির্মল বসু সম্পাদিত
পূজাবার্ষিকী
ঝলমল
দাম : ৫৫ টাকা মাত্র

লিখেছেন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কালিদাস রায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
কামিনী রায়
সুবিনয় রায় চৌধুরী
মণীন্দ্রলাল বসু
অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত
সুখলতা রাও
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
নরেন্দ্র দেব
কুমুদরঞ্জন মল্লিক
প্রেমেন্দ্র মিত্র
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
জলধর সেন
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মৈত্রেয়ী দেবী
কাজী নজরুল ইসলাম
রাধারানী দেবী
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
হেমেন্দ্রলাল রায়
প্রবোধ কুমার সান্যাল
হেমেন্দ্র কুমার রায়
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
মন্মথ রায়
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু
এবং আরও অনেকে

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বিদ্যার দেবী সরস্বতী

পথিক মণ্ডল

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি। চারদিকে দেবী সরস্বতীর আরাধনা হচ্ছে। নানান বয়সের নারীপুরুষ সাগ্রহে দেবীকে অঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীরা। বিদ্যার্জনের আশায় তারা নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোয় সামিল হয়েছে।

সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণই সর্বপ্রথম সরস্বতীর পুজো করেছিলেন। তিনি সরস্বতীর আরাধনাকালে বলেছিলেন, তুমি আমার জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তোমাকে আশ্রয় করেই সকল সঙ্গীত, তাল-লয় বিরাজ করবে। বিদ্যার শুরুতে মানবগণ তোমার পুজো করবে। তুমি চৈতন্যদায়িনী। প্রতি মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে মানুষ ষোড়শোপচারে তোমার আরাধনা করে সন্তুষ্ট হবে। তুমি আমার দেওয়া এই পুজো গ্রহণ করো।

এরপর সরস্বতী পুজোর প্রচলন হয়। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে সরস্বতীর দুটি রূপ বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি নদী রূপে এবং দ্বিতীয়টি দেবী রূপে। বৈদিক যুগে সরস্বতী ছিলেন নদী রূপে এবং পৌরাণিক যুগে তিনি হন বিদ্যার দেবী রূপে সুপরিচিতা। 'বেদ'-এ তাঁকে নদী রূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অপরদিকে নারদীয় পুরাণ, কর্মপুরাণ ও দেবীপুরাণ-এ তিনি দুর্গা ও শিবের কন্যা। প্রাচীনকালে সরস্বতী নামে নদীর অস্তিত্ব ছিল। বৈদিক যুগে এই নদীটির তীরে গড়ে উঠেছিল একাধিক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। নদীর দুই কূলে আর্য মুনি-ঋষিদের সুন্দর আশ্রম নদীকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল। সেখানে প্রতিদিন যাগযজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ ও স্তব উচ্চারিত হতো। নদীতীরে উর্বরা মাটির জন্য সুন্দর ফসল হতো, ফলে আর্যরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। এছাড়া সরস্বতী নদীর জলপথে পরিবহন ও বাণিজ্যের

সুবিধা ছিল। বর্তমানে এই নদী লুপ্ত হয়ে গেলেও এর অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে কিছু তথ্য সম্প্রতি বিশেষজ্ঞদের হাতে এসেছে। গুজরাটের সাম্প্রতিক ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর উপগ্রহ মারফৎ যে ছবি তোলা হয়েছে তাতে দীর্ঘ বিস্তৃত একটি লুপ্ত নদীর চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। নানান শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এই নদীটিকেই মনে করা হচ্ছে সরস্বতী নদী।

সরস্বতীর বাহন হাঁস। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে বাহন নিয়ে নানা কথা বলা হলেও দেবদেবীদের বাহনের মধ্যে হাঁস-ই অগ্রগণ্য। বাহনটি ব্রহ্মার দেওয়া। ব্রহ্মারও নিজস্ব বাহন হাঁস। পুরাণের পাতায় সরস্বতীর বাহন বদলানোর একাধিক উল্লেখ রয়েছে। কখনও বাহন হয়েছে ময়ূর, সিংহ অথবা মেষ। এক সময় সরস্বতীর পুজোয় মেষ বলির প্রচলন ছিল। প্রাচীন আকর গ্রন্থ 'সাঙ্খ্যায়ন'-এর একাধিক সূত্রে সরস্বতী পুজোয় মেষ বলির কথা জানা যায়। মুম্বায়ের বহু স্থানে আজও ময়ূরবাহনা সরস্বতী মূর্তির পুজো হয়। বারাণসীর বিখ্যাত সরস্বতী মন্দিরে যে প্রতিমা রয়েছে তাঁর বাহন সিংহ। আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশের মিউজিয়ামে পাথরের তৈরি একাধিক সরস্বতী মূর্তিতে বাহন রয়েছে সিংহ। পরবর্তী কালে দুর্গার বাহন সিংহ এবং কার্তিকের বাহন ময়ূর হওয়ায় কালক্রমে সরস্বতীর বাহন হয়ে দাঁড়ায় হাঁস।

বাহন শুধু নয়, সরস্বতীর রূপ বদলও হয়েছে। নবদ্বীপে পদ্মের উপর উপবিষ্টা সপ্ততন্ত্রী বীণাহস্তা দেবী সরস্বতীর মূর্তির পুজো হয়। তিব্বতে সরস্বতী মূর্তির হাতে বীণার বদলে বজ্র ধরা আছে। জাপানে সর্পাসনা সরস্বতী মূর্তির পুজো প্রচলিত। চীনে 'কান্‌জাং' নামে যে মূর্তির পুজো হয় তা মূলত সরস্বতীরই পুজো। মূর্তির রঙ কুচকুচে কালো।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

এখন ভরা শীত। কলকাতায় তার কামড়টা ঠিক তেমনভাবে বোঝা যায় না। গ্রামের দিকে ঠাণ্ডা বেশ জমিয়ে পড়ে। চারদিকে বিছিয়ে থাকে কুয়াশার সাদাটে চাদর। পায়ের তলায় শিশিরভেজা ঘাস। দূরের কিছুই দেখা যায় না। বেলা বাড়লেই সোনালী রোদ এসে কুয়াশাকে হটিয়ে দেয়। কোনো কোনো দিন হু হু করে হাওয়া বয়। গাছের শুকনো পাতা পথের ধুলোকে সঙ্গী করে উড়ে বেড়ায়। শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, কাঠবাদামের মতো কিছু গাছ ততদিনে ন্যাড়া হয়ে গেছে। শীতের হাওয়ার কাঁপন যে লেগেছে সেই সব গাছের ডালে ডালে। ওদিকে পাড়ায়-পাড়ায় ক্রিকেট খেলার ধুম। এখানে-ওখানে পিকনিক। তারই মাঝে শুরু হয়ে যায় সরস্বতী পুজোর তোড়জোড়। আজকাল আর কেউ মানে না। আগে আমরা সরস্বতী পুজোর আগে পর্যন্ত কুল খেতাম না। কার বাগানের বা টবের গাঁদা কত বড় তাই নিয়ে চলত কমপিটিশান। গাঁদার পাশে চন্দ্রমল্লিকা আর বড় বড় ডালিয়া ফুল বাগান আলো করে রাখে। আম গাছে বোল ধরে। বাতাসে ভাসে তার মিষ্টি গন্ধ।

ওদিকে আবার মাঘ মাস মানেই শীতের শেষ হয়ে আসা। দিন আস্তে আস্তে বড় হতে আরম্ভ করে। অবশ্য রাত এখনো বড়। রাত্তিরে যদি আকাশের দিকে তাকাও তাহলে দেখতে পাবে ছায়াপথ দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে চলে গেছে। পশ্চিম আকাশ থেকে কুম্ভ রাশি হারিয়ে যাচ্ছে। পুব আকাশে কর্কট রাশি দেখা দিয়েছে, সিংহ রাশির খানিকটাও দেখা যায়। সিংহ রাশির 'মঘা' নক্ষত্রের নাম থেকেই এই মাসের নাম মাঘ। তা তো হলো, তোমরা কে কোথায় পিকনিক করতে গিয়েছিলে জানিও কিন্তু। ক্রিকেট খেলাই বা কেমন হচ্ছে? তা ছাড়া ব্যাডমিন্টন, ভলি, বাস্কেটবল কত খেলাই না এখন মজাসে খেলা যায়। শীতকালে খেয়ে সুখ, বেড়িয়ে সুখ, খেলেও সুখ—তাই না?

এবার এসো তোমাদের কয়েকজনের চিঠির উত্তর দিই। তার আগে আরও একটা কথা বলে নিই। তোমরা এখনো চিঠি দিয়ে জানতে চাইছো, চিঠিপত্র, লেখা, ছবি, কবিতা বা ছড়া কোন ঠিকানায় পাঠাবে। আগেও বলা হয়েছে, আবারও বলছি। তোমরা লেখা, কবিতা, ছড়া, চিঠিপত্র যাই পাঠাও পাঠাবে সম্পাদক শুকতারার নামে। ঠিকানা হলো, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। চিঠির ওপরে শুধু লিখে দেবে কোন বিভাগ—যেমন তোমাদের পাতা, মজার পাতা, খেলা, গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি।

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায় (১১০/এ, বাঙ্গুর পার্ক, রিষড়া, হুগলী-৭১২ ২৪৮)

উত্তর ঃ দাদুমণির ওপর অতো রাগ করতে আছে নাকি! আর নিশ্চয়ই রাগ নেই। এবার হেসে ফেলো। স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতায় তুমি লেখা পাঠাতেই পারো। ঠিকানা একই—স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতা, প্রযত্নে—সম্পাদক শুকতারা, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা—৭০০ ০০৯।

সঞ্জয় লাহা (দ্বাদশ শ্রেণী, প্রযত্নে—দুলাল চন্দ্র লাহা, রজিপুর, পোঃ হাসনাবাদ, ২৪ পরগনা)

উত্তর ঃ শুকতারা তোমার কেমন লাগে জানাওনি তো! শুকতারার বন্ধুরা তোমায় নিশ্চয়ই চিঠি দেবে। তুমিও দাও না। দেখবে তুমিও কত উত্তর পাবে।

প্রসেনজিৎ সামন্ত (৫৩/৩৫/১, বিদ্যায়তন সরণী, আলমবাজার, কলকাতা-৭০০ ০৩৫)

উত্তর ঃ তোমার বাবা এখন কেমন আছেন? একটা কথা মনে রেখো ভাই, বাবা-মার সেবা-যত্ন করার সৌভাগ্য সবার হয় না। তুমি ভাগ্যবান তাই এই সুযোগ পেয়েছো। বুঝতে পারছি, সারাদিন কাজ করার পর একটু কষ্ট হয়। তা হোক। পরে দেখবে এই সব দিনের কথা মনে করে কত তৃপ্তি পাবে। মনে রেখো জীবনটাই হচ্ছে সংগ্রাম। সেখান থেকে পালাতে নেই। রুখে দাঁড়াতে হয়। বুঝেছো! তোমার জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে।

অভিজিৎ দাস (বিধান শিশু সরণী, পুলিশ হাউজিং কমপ্লেক্স, ব্লক-এ, রুম-৩০৩, কলকাতা-৭০০ ০৫৪)

উত্তর ঃ 'আমরা বলছি' বিভাগটিতে এক একবার এক একটি স্কুলের ছেলেরাই শুধু এখন লিখতে পারে। পরে হয়তো এই বিভাগটা সকলের জন্যে খুলে দেওয়া হবে। হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল, নাট্যে কথামৃত তোমার ভালো লাগে জেনে আমাদেরও ভালো লাগছে।

সুকল্যাণ সামন্ত (ভেমুয়া হস্টেল (ছাত্র), পোঃ ভেমুয়া, সবং, মেদিনীপুর-৭২১ ১৫৫)

উত্তর ঃ শুকতারা আর বইই তোমার প্রকৃত বন্ধু। এই কথাটা মনে রাখলে বন্ধুর অভাব কোনোদিনই হবে না। যখন মন খারাপ হবে কিংবা একা লাগবে তখন বই আর শুকতারা পড়লেই দেখবে মন ভালো হয়ে গেছে।

শ্রাবন্তী (ঠিকানা নেই)

উত্তর ঃ ঠিকানা দাওনি কেন? শুকতারায় রহস্য গল্প তো প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকে। এখন তো আবার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ধারাবাহিক গোয়েন্দা উপন্যাস ছাপা হচ্ছে। খুশি তো? তুমি যে যে বই কিনতে চাও, টাকা পাঠিয়ে দিলেই সেগুলো বাড়ি বসে পেয়ে যাবে।

মণিদীপ্ত সাহা (প্রযত্নে—নির্মল কুমার সাহা, ১১৯৫/বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, হরিদেবপুর, নোনামাঠ, কলকাতা-৭০০ ০৮২)

উত্তর ঃ তোমার চিঠি পড়ে বোঝা যায় শুকতারাকে তুমি কতটা ভালোবাসো। শুকতারার বন্ধুরা তোমায় নিশ্চয়ই চিঠি দেবে। তুমিও দাও না। দেখো ঠিক উত্তর পাবে।

অয়ন ঘোষ (১০১/সি/১/২, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কদমতলা, হাওড়া-৭১১ ১০১)

উত্তর ঃ তুমি ক্লাস সেভেনে পড়ো। এবার এইটে উঠবে। শুকতারা তোমার ভীষণ ভালো লাগে। ভালোবাসো শুকতারার বন্ধুদের। তাই এবার তুমিই তাদের চিঠি দাও। ঠিক উত্তর পাবে।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

দেবী বন্দনা

জ্ঞানের দেবী সরস্বতী
তোমায় পূজি আজ
মোর কণ্ঠে বসে তুমি
করো তোমার কাজ॥

শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা
শুভ্রহংস প'রে
বীণাহস্তে বীণাপাণি
প্রণাম তোমারে॥

নানা দ্রব্য অর্ঘ্য দিয়ে
ধূপ ও দীপ জ্বেলে
তোমাকে অঞ্জলি দিই
এই আঙিনা তলে॥

অঙ্কন পাল,
বয়স দশ, চতুর্থ শ্রেণী,
বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়,
নদীয়া

অরুণিমা ঘোষাল, বয়স দশ, চতুর্থ শ্রেণী,
ভারতীয় বিদ্যাভবন, কলকাতা

ধ্বংসের মুখে কাশ্মীর

হিমালয়ের কোলে স্থিত কাশ্মীর
হিমালয় তার সুরক্ষা প্রাচীর।
ভারতের উত্তরে এক রাজ্য
বলা হয় তাকে পৃথিবীর স্বর্গ।
শুভ্র বরফে ঢাকা পর্বতাঞ্চল,
কিন্তু আজ তার বুকে—
জ্বলছে হিংসার অনল।
হিমালয়ের শুভ্র শিখর আজ
মানুষের রক্তে হয়েছে লাল;
সন্ত্রাসের কালো ছায়া কাশ্মীরে
হেনেছে মৃত্যুজাল।
আজ কার্গিল যুদ্ধ
কাল বোমা বিস্ফোরণ
এই ধ্বংসের কি নেই প্রতিকার,
এই স্থিতির হবে না কোনো উন্নয়ন?
তবে কিসের স্বাধীনতা?
কিসের উৎসব?
যখন কাশ্মীরে চলছে খুনোখুনি,
মরছে মানুষ সব?

গার্গী দত্ত, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী, ডি. এ. ভি. পাবলিক স্কুল, এম. টি. পি. এস., বাঁকুড়া

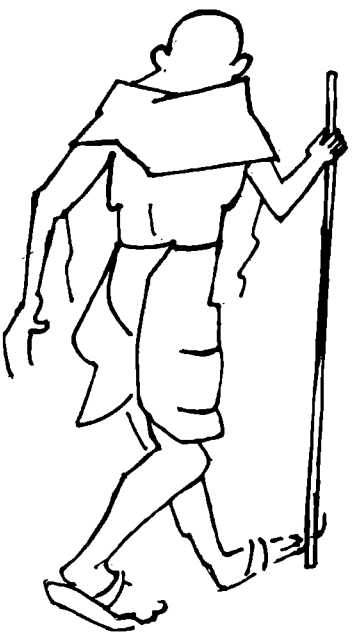

তথাগত দত্ত, বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী,
সেন্ট স্টিফেন স্কুল, কলকাতা

অভিষেক চ্যাটার্জী, বয়স পনেরো, নবম শ্রেণী,
ব্যারাকপুর রাষ্ট্রীয় (গভঃ) উচ্চ বিদ্যালয়,
উঃ ২৪-পরগনা

সেই মাছটি

এক যে ছিল নদী;
তাতে পা ডোবাতে যদি
অমনি এক মাছ,
যার গা ছিল কাচ কাচ,
সে পায়ের উপর চড়ে
রেগে কামড়ে দিত জোরে।
বলত, 'ডাঙায় যাও, ডাঙায় তোমার বাসা
আমরা বরং জলে আছি খাসা।।

তিয়াসা চট্টোপাধ্যায়,
বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়,
কলকাতা

সৌর্য ঘোষ, বয়স সাড়ে এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, ক্যালকাটা বয়েজ

মায়ের হাসি

মায়ের হাসি শান্ত সবুজ
সরল সতেজ সাদা,
মায়ের হাসিতে পার হয়ে যাই
বহু দুর্গম বাধা।
মায়ের হাসি সুনীল আকাশ
সৃষ্টি সুখের দিন,
মমতা মাখানো স্নেহের পরশ
প্রীতি স্পর্শের ঋণ!
মায়ের হাসিতে খুঁজে পাই আমি
ছোট্ট ছেলেবেলা,
মায়ের হাসিতে স্মৃতি জেগে ওঠে
ঘুমপাড়ানিয়া খেলা।
মায়ের হাসি দেখেছি তাইতো
জীবন স্বপ্নময়
মাটির ধরণী তাইতো আজো
সুখের স্বর্গ হয়!

কমলেশ কুমার,
বয়স ষোল, একাদশ শ্রেণী,
বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, বর্ধমান

আমরা মানুষ

আমরা মানুষ, হয়েছি সভ্য, করব না হানাহানি,
করব না মোরা যুদ্ধ করে, ধ্বংস স্বদেশখানি।
উড়ব না ওই আকাশপথে, যুদ্ধবিমান চড়ে,
বোমা ফেলে দিয়ে করব না ক্ষতি, পৃথিবীর নানা স্তরে।
করব না মোরা অস্ত্রশস্ত্র, বিমান বোমার সৃষ্টি—
এগুলি যখন দেশ ধ্বংসায়, লাগে কী খুবই মিষ্টি?
করব না মোরা কামান দেগে, ধ্বংস পরের দেশ,
করব না মোরা ধ্বংস করে, গাছপালা সব শেষ।
করব না মোরা পরদেশের সঙ্গে, যুদ্ধ মারামারি,
আনব মোরা শান্তি জগতে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি।।

দীপঙ্কর চন্দ, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী, শরৎচন্দ্র সুর ইনস্টিটিউশন, কলকাতা-১৫

বিদিশার স্কুল

হিল তোলা জুতো পরে
গট গট পায়,
বিদুষী বিদিশা দিদি
ইস্কুলে যায়।
নদীতীরে, 'নিবেদিতা'
ফুরফুরে হাওয়া,
টিফিনটা ঘুরে আসে
বৃথা সেথা যাওয়া।

সৌরভ ভট্টাচার্য,
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
ইলিয়াস মেয়র ফ্রী স্কুল, কলকাতা

নামতা

দুই এক্কে দুই, মাদুর পেতে শুই;
দুই দুগুণে চার, দুলছে ছাদের তার।
তিন দুগুণে ছয়, ঝাঁ ঝাঁ রোদের ভয়;
চার দুগুণে আট, ফুটিফাটা মাঠ।
পাঁচ দুগুণে দশ, খাচ্ছি লেবুর রস;
ছয় দুগুণে বারো, ঘাম ঝরছে বড়ো।
সাত দুগুণে চোদ্দ, গরমে হলাম সেদ্ধ;
আট দুগুণে ষোলো, আম-মাখাটি ভালো।
নয় দুগুণে আঠেরো, ভাবছি সাত-সতেরো;
দশ দুগুণে কুড়ি, বিকেলে ওড়াব ঘুড়ি ।।

অনিন্দ্যা বসু, বয়স তেরো, নবম শ্রেণী, সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল

মিতুল চক্রবর্তী, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
বালিকা বাণী মন্দির, চুঁচুড়া, হুগলী

বিষয় : প্রবীণ প্রজন্ম ও আমরা : দমদম মতিঝিল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক)

আমরা বলছি

[বিদ্যালয়-পরিচিতি : ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে দমদম রোডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় দমদম মতিঝিল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক)। প্রথমে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা হলেও এটি পরে উচ্চ মাধ্যমিক-এ উন্নীত হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ১৫০০। বিদ্যালয়ে এক প্রাক্তন ছাত্রীর স্মৃতিতে তৈরি হয়েছে 'করবী মেমোরিয়াল হল'। একটি জিমন্যাসিয়াম হলও তৈরি হয়েছে। বর্তমানে এখানে শিক্ষিকার সংখ্যা ৪০। বিদ্যালয়ের ভিতরে একটি ছোট্ট মাঠ এবং সুন্দর বাগান রয়েছে। শুধুমাত্র পড়াশুনা নয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যথেষ্ট অগ্রণী।—হরিসাধন চন্দ্র]

প্রথম

কুসংস্কারে মোহাচ্ছন্ন বর্তমান সমাজের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে প্রবীণ সমাজের মতামতের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের মতামতের পার্থক্য বা 'GENERATION GAP'। বর্তমানে এই সমস্যার সম্মুখীন জনসমাজ। ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা উন্নত হবার উদ্দেশ্যে বদলিয়েছি অনেককিছু, বদলিয়েছি আমাদের শিক্ষা, আচার-আচরণ, ভাবনা প্রভৃতি। শিক্ষার সাহায্যেই আজ আমরা নানান কুসংস্কারের বাঁধন ভাঙতে পেরেছি। সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কারকে আঘাত করে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে গ্রহণ করেছি, হয়েছি স্বাধীন মনোভাবাপন্ন। তাই আজ প্রবীণ প্রজন্ম এবং আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মতপার্থক্য।

আমরা নবীন প্রজন্মের বাহকরা প্রবীণ প্রজন্মের সমস্ত কিছুকে এক সংশয় এবং কুসংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি। কিন্তু প্রবীণ প্রজন্মের সময়ের সঙ্গে নিজেদের বিচার আমরা করি না। কারণ আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তাঁরা তা নন। কিন্তু তাঁদের সমস্ত কুসংস্কার ও বিশ্বাসকে ফেলে দিলেও তাঁরা যে আমাদের মতোই ঐতিহ্য ও সংস্কারের পরিচায়ক, তা অমান্য করতে পারি না। তাহলে ছোট করা হবে নিজের দেশকে এবং নিজেদেরকে। কিন্তু একথাও সত্য যে আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যে কুসংস্কারের বীজ বহুদিন আগেই বপন করা হয়েছিল। বর্তমানে বিজ্ঞানের আলোকে তার অনেকটাই কেটে গেলেও আজও বহুক্ষেত্রে নানান ধর্মীয় ভণ্ডামি লক্ষ্য করা যায়। এগুলি প্রবীণরা অলৌকিক বলে মেনে নিলেও নবীনরা মানতে চায় না। 'যুগের সাথে মানুষ বদলায়'—এই বাক্য সত্যি হলেও আমরা যুগের সঙ্গে পরিপূরক হয়ে উঠতে পারি না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তৃত হতে থাকে। তাই তখন সৃষ্টি হয় যে প্রজন্মের, তারা শিক্ষার আলোকে আঘাত করে কুসংস্কারের ভূতকে। বিজ্ঞান যত বিস্তৃত ও উন্নত হয়, ততই এই সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে। এই প্রজন্ম মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটায় নব যুক্তির আলোকে দেখা এক নতুন দিগন্তের। এরা চিহ্নিত হয় নবীন প্রজন্মরূপে। এই নবীন প্রজন্মকে স্বাগত জানাই। ওরাই এই ভারতবর্ষের বুকে এক নতুন দিগন্তের ধারাকে নামিয়ে আনতে সক্ষম।

আমি এই নবীন প্রজন্মেরই একজন বাহক। তাই আমি এই প্রজন্মকেই সমর্থন করব। কিন্তু মেনে নিতে পারব না পাশ্চাত্য নেশায় উন্মত্ত সেই সমস্ত নব প্রজন্মের বাহককে, যারা নিজেদের সংস্কার ত্যাগ করেছে, বিকৃত করেছে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিকে, বাহক হয়েছে কেবল এক বিকৃত রুচি ও আচরণের।

সৃষ্টির শুরু থেকে যুগ বদলাচ্ছে, বাড়ছে মানুষের জানার ও বোঝার পরিধি। বিজ্ঞান হচ্ছে উন্নত। পুরনো চিন্তা ত্যাগ করে মানুষ হয়ে চলেছে আধুনিক থেকে আধুনিকতম। তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে আমাদের প্রত্যেককে নতুনভাবে ভাবতে হবে, বদলাতে হবে নিজেদের চিন্তাধারা ও মানসিকতাকে। আমরা যখন এই পৃথিবীকে নতুন ভাবে কল্পনা করব, দেখতে আরম্ভ করব এবং আমাদের নব প্রজন্মকে সঠিকভাবে বুঝব, সেদিনই মিলিয়ে যাবে আমাদের মধ্যে যত মতপার্থক্য। নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখে আমরা হয়ে উঠব নব প্রজন্মের প্রকৃত সঙ্গী।

অর্পিতা পাল
একাদশ শ্রেণী

দ্বিতীয়

আজকের যুবসমাজ তাদের জীবনকে নতুনভাবে চালনা করতে, উপভোগ করতে এবং অন্যদের থেকে আলাদাভাবে চলার চেষ্টা করে। এইভাবে চলতে গিয়ে অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রবীণ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বা মতান্তর ঘটে। ঠিক এইখানেই প্রবীণ সমাজ ও যুব সমাজ পৃথক হয়ে যায় বা Generation gap-এর সৃষ্টি হয়।

আজকের পৃথিবী উত্তরোত্তর উন্নতি করছে। প্রতিটি পদক্ষেপে আগের চিন্তাধারা পুরাতন বলে চিহ্নিত হচ্ছে। আজকের এই জেট যুগে থেমে থাকার কোনো উপায় নেই। সর্বত্র চলছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কি শিক্ষা, কি কর্মক্ষেত্র সর্বস্তরে এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য যুবসমাজকে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে, যুঝতে হচ্ছে। কেউ এর মধ্যে পিছিয়ে পড়লে বা হেরে গেলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। তাই পুরাতন চিন্তাধারা নিয়ে এগোলে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে হবে। আধুনিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ করতে গিয়েও বেশিরভাগ সময় প্রবীণ সমাজের সঙ্গে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অনেক সময় প্রবীণ সমাজ ও যুব সমাজের মধ্যে মতপার্থক্য প্রকটভাবে দেখা যায়। প্রবীণ সমাজের বক্তব্য—তাঁদের সময়কার সংস্কৃতি সাহিত্যনির্ভর ছিল। ফলে তা ছিল অত্যন্ত মনোগ্রাহী ও রুচিশীল। কিন্তু এখনকার সংস্কৃতির বেশিরভাগই কুরুচিপূর্ণ যা

আমাদের মানসিকতায় নেতিবাচক পরিবর্তন আনতে বাধ্য। কিন্তু সমাজ ভালো-মন্দয় গড়া। সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই সমাজ গড়ে ওঠে। মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানসিক গঠনে এই সংস্কৃতির বিপুল অবদান। তাই সমাজে তথা সংস্কৃতিতে কিছু ভালো দিক থাকলে তার কিছু মন্দ দিকও আছে। এক্ষেত্রেও Generation gap ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।

বর্তমানে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের বিভিন্ন কারণে মতান্তর ঘটছে। ফলে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। পিতা-মাতা আমাদের মঙ্গলের জন্যই সমস্ত কিছু করেন, কিন্তু অনেক সময় তাঁদের কৃতকার্য সন্তানের ওপর আরোপিত করে দেওয়া হয়। পিতা-মাতা মনে করেন তাঁদের এই কাজ সন্তানের মঙ্গল সাধনই করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সন্তান তাঁদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন কারণে মতান্তর ঘটতে পারে। অনেক সময় সন্তানের চলাফেরা, আচার-ব্যবহার পিতা-মাতার কাছে দৃষ্টিকটু লাগতে পারে। কারণ তাঁদের সময় জীবনধারা আজকের মতো ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন হয়। তাই এই সমস্ত কিছু যাতে মতান্তরের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে পিতা-মাতা তথা সন্তানকে নজর দিতে হবে।

আজকের এই চলমান পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের অভাব ঘটেছে। মূল্যবোধের পরিবর্তনও হয়েছে। মানুষের প্রতি সদ্ভাব ক্রমশ লুপ্ত হচ্ছে। মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা বেশি করে প্রবেশ করেছে। যার প্রধান কারণ একে অপরকে পিছনে ফেলে জীবনযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার মনোভাব। তাই এখন পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্যান্য গুরুজনের সঙ্গে সন্তানের বা নবীন প্রজন্মের সেই সহজ, সরল, খোলামেলা সম্পর্ক প্রায় অনুপস্থিত। ফলে উভয়পক্ষই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাই প্রয়োজন নবীন ও প্রবীণ প্রজন্মের সঠিক মেলবন্ধন।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রবীণ প্রজন্মের ব্যক্তিরা সবসময় মঙ্গল সাধনের কথা বলেন, কিন্তু তা সর্বদা সঠিকভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই যদি হতো তবে কোনোদিন বিপ্লব সংঘটিত হতো না। নবীন প্রজন্মের মধ্যে অর্থাৎ যুবসমাজের মধ্যে যে প্রবল অজানাকে জানার আগ্রহ তার পূর্ণ বিকাশ ঘটত না। যুবসমাজের মধ্যে আবেগ-উচ্ছ্বাসের জোয়ার দেখা যেত না। নবীন প্রজন্ম তাদের জ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে নতুনকে গ্রহণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তা না হয়ে যদি পুরাতনকে নিয়েই আমরা চলতাম তবে সভ্যতার অস্তিত্বের সংকট দেখা দিত। সমাজের ও সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হতো। সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়তো।

সবশেষে এই কথাটি বলা যায় যে আমরা সবকিছু পুরাতনকে নিয়ে চলব না। সভ্যতার অগ্রগতির জন্য নতুনের আহ্বান প্রয়োজন। আবার পুরাতনকে ত্যাগও করব না, কারণ পুরাতনই হলো নতুনের ভিত্তি। আমরা নতুন সংস্কার গ্রহণ করব এবং আধুনিক জীবনধারায় অভ্যস্ত হব। কিন্তু কখনই তা আমাদের সংস্কৃতিকে বর্জন করে নয়। তা করলে সেটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হবে এবং আমাদেরও পরবর্তী নবীন প্রজন্ম তাদের আদর্শ, কর্ম সম্পর্কে অবগত হবে না। এই কারণে আমাদের পুরাতন ও নতুন দুইয়ের সমন্বয় সাধন করে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলতে হবে।

মনোশ্রী বীট
একাদশ শ্রেণী

The New Edition of A. T. Dev's

STUDENT'S FAVOURITE DICTIONARY

(Eng. To Beng. & Eng.)

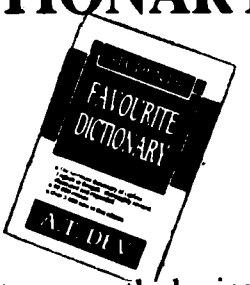

- The foremost dictionary of Current English to Bengali thoroughly revised, illustrated and expanded.
- New demy size.
- Over 40,000 entries in this edition.
- Up-to-date coverage of new words.
- Encyclopaedic appendices covering language and literature, mythological characters, biographies, quotations, world gazetteer, Greek and Russian alphabet, weights and measures, mathematical formulas, abbreviations.

Dev Sahitya Kutir (P) Ltd., 21, Jhamapukur Lane, Calcutta - 700 009

কাগুজে ডাকাত

বিপুল মজুমদার

দলা পাকানো এক টুকরো কাগজ দোতলার জানলা গলে বিছানার উপর এসে পড়ল। গোলাপী শুয়ে ছিল। শুয়ে শুয়ে একমনে টিনটিনের বই পড়ছিল। দলা পাকানো কাগজের টুকরোটা টুক করে তার ঠিক মাথার পাশটায় এসে পড়তেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। পরিস্থিতি আঁচ করা মাত্রই হুড়মুড়িয়ে খাট থেকে নেমে জানলার কাছে পৌঁছে গেল। জানলার রডে মুখ চেপে যতদূর দেখা সম্ভব ততদূর দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু কালো চুলের ঝাঁকড়া একটা মাথা ছাড়া আর কিছুই নজরে এল না। জানলার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সুপারি গাছটা বেয়ে কে যেন সড়াৎ করে নেমে গেল!

খানিকক্ষণ জানলার পাশে কাটিয়ে ব্যর্থ গোলাপী আবার বিছানায় ফিরে এল। দলা পাকানো কাগজের টুকরোটা সাদা চাদরের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। কৌতূহলী গোলাপীর আর তর সয় না। সে কাগজের দলা খুলে চটপট সেটাকে পড়ে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পড়তে গিয়ে মহা বিপত্তি! যত পড়ে ততই মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। শেষটায় 'ও মাগো' বলে চোখমুখ উলটে জ্ঞান হারাল গোলাপী। মুঠোর মধ্যে কাগজের দলাটা শক্তভাবে ধরাই রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দোতলার ঘরখানা পরিবারের লোকজনে পূর্ণ হয়ে গেল। ছুটির দিন বলে সবাই বাড়িতে। তারা এসে গোলাপীকে ঘিরে ধরল। নিচের তলায় দু-ঘর ভাড়াটে আছে। খবর পেয়ে তারাও সিঁড়ি ভেঙে দুদ্দাড় ছুটে এল। গোলাপীর ফিটের কোনো ব্যামো নেই। তবু এ কি অনাসৃষ্টি! জ্ঞান ফেরানোর জন্য কেউ ডাকাডাকি করল, কেউ চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিল। একজন আবার নিজের চামড়ার চটিটা মেয়েটির নাকের সামনে এনে দোলাতে থাকল। সাতজনের সাতরকম কাণ্ডকারখানার মধ্যে হঠাৎ কাগজের টুকরোটার দিকে গোলাপীর বাবার নজর গেল। মেয়ের মুঠো আলগা করে সেটিকে বের করলেন তিনি। চিরকুট পড়ে পলকে ভদ্রলোকের চোখ ছানাবড়া! বুকের নিচে দুদুম করে কে যেন হাতুড়ি পিটে দিল। এমন আতঙ্কজনক চিঠি পড়লে যে কোনো মেয়ে অজ্ঞান হবে। গোলাপী তো কোন ছার।

তিনদিন পরেই গোলাপীর বিয়ে। বিয়ের আয়োজন বলতে গেলে প্রায় সারা। কাপড়চোপড় গয়নাগাঁটি এমনকি আসবাবপত্র পর্যন্ত আগাম কিনে ফেলা হয়েছে। আগামীকাল সকালে ডেকরেটারের লোকজন এসে প্যান্ডেল বাঁধতে শুরু করবে। কিন্তু তার আগেই একি বিপত্তি! বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো রঘু ডাকাতের রক্ত হিম করা পত্রাঘাত! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন গোলাপীর বাবা অবিনাশ।

এদিকে পুরনো চটিজুতোর গন্ধে গোলাপী ধীরে ধীরে চোখ মেলল। ঘরভর্তি লোকজন দেখে তার সবকিছু মনে পড়ে গেল। সে মুঠো আলগা করে কাগজের দলাটা খুঁজতে চাইল। তাই দেখে অবিনাশবাবু বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'ওটা আমার হাতে।' বাবার কথায় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল গোলাপী। ওর কান্না শুনে ঘরভর্তি লোকেরা সব চঞ্চল হয়ে উঠল। সবাই কৌতূহলী হয়ে চিঠিটার উপর ঝুঁকে পড়ল। যত রহস্যের চাবিকাঠি ঐ চিঠির মধ্যে।

এরপর চিঠি ঘুরতে থাকল এক হাত থেকে অন্য হাতে। গোলাপীর মা থেকে শুরু করে কাকা-কাকী, দাদা-বৌদি সবাই পড়ল ঐ চিঠি। চিঠি পড়ে গোলাপীর মা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কান্না জুড়ে দিল। গোলাপীর ব্যায়ামবীর কাকা তাই দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ল, 'যতই হুমকি দিক না কেন, পুলিশে একটা খবর দেওয়া দরকার।'

কাকীমা সঙ্গে সঙ্গে হেই হেই করে উঠল, 'খবরদার। ওতে হিতে বিপরীত কিছু হয়ে যেতে পারে। রঘু ডাকাত শেষ লাইনে দু-দুবার বলেছে—পুলিশে জানালে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে।'

বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল কাকা, 'তাহলে আর কী, হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। তিনদিন পরে বিয়ে। ডাকাতটার হাতে সর্বস্ব সঁপে দিয়ে হরির নাম জপি।'

গোলাপীর দাদা বলল, 'পাড়ার ছেলেদের নিয়ে লাগাতার পাহারা দেওয়া শুরু করলে হয় না? দেখি না ও ব্যাটার কত হিম্মত!'

শোকের মধ্যে হাত তুলে নিষেধ করলেন গোলাপীর বাবা অবিনাশবাবু, 'কোনোরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। আগাম চিঠি দিয়ে যখন জানাতে পেরেছে তখন ইচ্ছে করলে বদমাশটা যা খুশি তাই করতে পারে।'

বাড়ির লোকেদের কথোপকথন শুনে গোলাপীর মায়ের কান্না আর এক স্কেল উঁচুতে উঠল, 'হে ভগবান, আমার এ কী সর্বনাশ করলে গো! শুভকাজ পণ্ড করবার জন্য নচ্ছার এক ডাকাতের আবির্ভাব ঘটালে!'

অবিনাশবাবু স্ত্রীকে ধমক দিয়ে ছেলেকে বললেন, 'নিধিরাম, রঘু ডাকাতের হিস্ট্রি কিংবা জিওগ্রাফি কিছু জানা আছে তোর?'

গোলাপীর দাদা নিধিরাম মাথা নাড়ল, 'এ নাম আগে কখনও শুনিনি। তবে ছেলেবেলায় গল্পের বইয়ের পাতায় এ নাম পড়েছি। নামটা বড্ড সেকেলে। আজকাল ডাকাতদের তো সব আধুনিক নাম—হাতকাটা ল্যাংচা, কানা পঞ্চানন, কানকাটা শম্ভু, ল্যাংড়া বিপিন....।'

গোলাপীর কাকা বলল, 'হবে হয়ত কোনো নতুন আমদানি। এইসব ভুঁইফোঁড়কে কড়া হাতে ট্যাকল করতে পারলে ভবিষ্যতে এ লাইনের ছায়াও মাড়াবে না। উজবুক কোথাকার।'

অবিনাশবাবু পানসে হাসলেন, 'ভুঁইফোঁড় হোক আর যাই হোক, ডাকাত তো! চালে ভুল করলে ধনেই নয় প্রাণেও মারা পড়ব।'

এতক্ষণ ধরে হাঁ করে কথা গিলছিল ভাড়াটে বাড়ির বউ কাজললতা। ঘটনার গুরুত্ব টের পেয়ে চিঠিটা সে হাতে নিল। চিঠিটাকে বারকয়েক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বার পর তার কপালেও একডজন ভাঁজ পড়ল। হাতের লেখা দেখে চোখের দৃষ্টি হয়ে গেল তেরছা। চশমাটা নাকের উপর ঠেলে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাতের লেখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কাজললতা। তারপর একসময় চিঠি ফেরৎ দিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে গম্ভীর মুখে সিঁড়ি ভেঙে একতলায় নেমে গেল।

চিঠি নিয়ে, রঘু ডাকাত নিয়ে শলা-পরামর্শ চালু রয়েছে তারমধ্যেই একটু পরে কাজললতা আবার ফিরে এল। সঙ্গে তার ক্লাশ সেভেনে পড়া ছেলে টুকাই। ছেলেটির মুখ কাঁচুমাচু। সজল চোখে চোরের মতো ভীতু চাহনি। কাজললতার চোখে লজ্জা। অবিনাশবাবুর কাছে গিয়ে নিচু গলায় সে বলল, 'রঘু ডাকাতকে ধরে ফেলেছি কাকু!'

কাজললতার কথা শুনে সবার চোখ প্রায় কপালে। বিস্ময়ে কারো মুখে কথা নেই। তার মধ্যেই অবিনাশবাবু কোনোক্রমে বললেন, 'কে.....! কোথায় সে.....!'

কাজললতা হাসল, 'এই তো আপনার হাতের নাগালের মধ্যেই—।' বলে টুকাইকে অবিনাশবাবুর দিকে ঠেলে দিল সে, 'এই হলো আপনার রঘু ডাকাত। কাণ্ডজ্ঞে বাঘ!'

অবিনাশবাবু হাসবেন না কাঁদবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। বিষম খেয়ে বললেন, 'টুকাই রঘু ডাকাত! কী বলছ বৌমা?'

'হ্যাঁ কাকু। হাতের লেখা দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। চেপে ধরতেই স্বীকার করল। যত রাজ্যের গোয়েন্দা গল্প পড়ে পড়ে মাথাটা ওর একেবারেই গেছে। কোন এক গোয়েন্দা গল্প থেকে হুবহু টুকে দিয়েছে চিঠিটা। গল্পতেও নাকি রঘু ডাকাত নামের এক ডাকাত কোন এক বাড়িতে ডাকাতি করবার আগে এমনি এক চিঠি দিয়েছিল। গোলাপী দিদির সঙ্গে মজা করতেই নাকি এমন কাণ্ড! বুঝুন ব্যাপার!'

সবটা শুনে অবিনাশবাবু হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। ঘর কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। অন্যরাও সমস্বরে সেই হাসিতে যোগ দিল। শুধু গোলাপী হাসল না। সে টুকাই-এর দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, 'ডেঁপো ছেলে!'

ছবি: অমিত চক্রবর্তী

নানা স্বাদের বই

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
চারটি রুদ্ধশ্বাস গোয়েন্দা উপন্যাস এক মলাটে
কিরীটী ৪ ৪০.০০
(নিশির ডাক, রক্তমুখী ড্রাগন, রাতের আতঙ্ক ও বিষের তীর)
সাদা কালো ৫৫.০০
আশাপূর্ণা দেবীর
গল্প ভালো আবার বলো ৪০.০০
শিবরাম চক্রবর্তীর
যত হাসি ততই মজা ৪০.০০
হাসির চোটে দম ফাটে ৫২.০০
হাসির ফোয়ারা ৪৫.০০ **হাসির টেক্কা** ৫৫.০০
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কেল্লা রহস্য ২০.০০ **সুড়ঙ্গ রহস্য** ২০.০০
ভাঙা বাড়ির রহস্য ২০.০০
জঙ্গল রহস্য ১৮.০০ **ফর্মুলা রহস্য** ২২.০০
পাতালঘর রহস্য ২০.০০
যাদুঘর রহস্য ২৫.০০
তীরন্দাজ ১৮.০০ **মুখোশ** ১৬.০০

ভূতের গল্প
গৌরী দের
রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প ২৪.০০
গা ছমছমে ভূতের গল্প ২২.০০
ভূতেরা ভয়ঙ্কর ২৬.০০
শিশির কুমার মজুমদারের
অমাবস্যার রাতে ২৫.০০
মানবেন্দ্র পালের
আতঙ্ক ৩৫.০০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর
অদ্ভুত যত ভূতের গল্প ২৬.০০

ভ্রমণ কাহিনী
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গুহা মন্দিরের দেবী ২৮.০০
(বৈষ্ণোদেবীর দরবারে যাবার গাইড বই)
সোমনাথের
শিবঠাকুরের বাড়ি ৩৫.০০
(দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদার যাবার গাইড বই)
প্রণবেশ চক্রবর্তীর
এই বাংলায়
(১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতিটি ৩৫.০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

মনের জানলা

জগদিন্দ্র মণ্ডল

[অধ্যাপক, ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
প্রাক্তন ডিন (বিজ্ঞান) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

প্রশ্ন ঃ আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। খুব ছোট থেকে আমি এবং আমার বাবা ও মা শুকতারার পাঠক। 'মনের জানলা' শুরু হবার পর আমি শুকতারার বন্ধুতে পরিণত হয়েছি। আজ আমি একটা সমস্যার সম্মুখীন। এই সমস্যার সমাধানের পথ দয়া করে জানিয়ে আমার উপকার করবেন।

আমার সমস্যা হলো, আমি যখন পড়তে বসি, তখন দু' ঘণ্টার বেশি পড়তে পারি না। পড়া ঠিক মতো মনেও রাখতে পারি না। এর জন্য বাবা-মা খুব বকেন। আমি চেষ্টা করি আরও বেশি পড়তে কিন্তু পারি না। দু'ঘণ্টা পর মন খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে, পড়তে ভাল লাগে না।

আমার আর একটা সমস্যা হলো আমি কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারি না।

সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা—রেজাল্ট ভাল করতে চাই। কিন্তু কী করে যে কী হবে সেটা ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না।

—অজয় রায়, বর্ধমান

উত্তর ঃ তোমার সমস্যা খুবই সাধারণ সমস্যা। সবারই কম-বেশি এরকম হয়। যখন পড়তে বস, তখন দু'ঘণ্টার বেশি পড়তে পার না। একটানা দু'ঘণ্টা পড়তে যদি পার, তাহলে তো আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তুমি অনেকটাই পড়তে পার। নিবিষ্ট মনে একটানা দু'ঘণ্টা পড়ে, একটু relax করে আবার একটানা দু'ঘণ্টা পড়, আবার একটু বিশ্রাম নিয়ে দু'ঘণ্টা পড়। এরকম করে ছ'ঘণ্টা পড়তে পার। এবং এরকম ভাবে একটু gap দিয়ে দিয়ে পড়াই বিজ্ঞানসম্মত। যা পড়লে, যা বুঝলে, তাকে মনের মধ্যে থিতিয়ে নেওয়ার জন্য একটু বিশ্রাম, একটু চুপচাপ থাকার প্রয়োজন আছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে দু'ঘণ্টা তুমি পড়, সেটা বই নিয়ে বসে থাকা না একাগ্র চিত্তে পড়ার মধ্যে ডুবে যাওয়া। যা পড়ছ তার মর্মে পৌঁছুবার চেষ্টা করা, না কেবল না বুঝে, কোনোরকমে উপর উপর পড়ে মুখস্থ করার চেষ্টা করা? পড়ার চরিত্র ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, তোমার পড়া কতটা কার্যকরী (effective) হবে—কেবল ঘড়ি ধরে সময় কাটানো বা সময়ের উপর নয়। পড়া ঠিক মতো মনে রাখতে পার না। এ বিষয়ে "মনের জানলা" বিভাগে আগেও লিখেছি। আর একবার লিখছি।

প্রথমে যা পড়ছ তার মর্মমূলে যাওয়ার চেষ্টা কর। লাইন ধরে ধরে মুখস্থ করে নেবে, এইরকম মানসিকতা নিয়ে পড়া আরম্ভ করবে না। প্রথমে পাঠ্যবিষয়টির মধ্যে যে যুক্তিবিন্যাস আছে, চুম্বক ভাব (Theme) রয়েছে, মন দিয়ে পড়ে তাকে বোঝার বা ধরার চেষ্টা কর (Conceptualise)। এতে প্রয়োজনে স্কুলে যিনি এ বিষয় পড়ান তাঁর সাহায্য নিতে পার। Class-এ যখন পড়ানো হয় তখন সেই পড়ানো মন দিয়ে নিবিষ্ট ভাবে শোন। পড়া মনে রাখার এটা হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত। ক্লাস-পড়ানো ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করবে। যদি কিছু না বোঝ, তখনই বা ক্লাসের পরে সেই বিষয়ের শিক্ষককে প্রশ্ন করে বুঝে নেবে। ক্লাস-পড়া ও বাড়ির পড়ার মধ্যে যেন একটা নিয়মিত ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। বাড়িতে এসে, ক্লাসে যা পড়ানো হয়েছে, তা বুঝে বুঝে বার বার পড়বে। নতুন পড়া পড়বে, সঙ্গে পুরনো পড়া revise করবে। একদিনে একটা পড়া শিখে মুখস্থ করে শেষ করে ফেলবে—এইরকম মানসিকতা নিয়ে উপরের ক্লাসে পড়া ঠিক নয়। নিচু ক্লাসের পড়ায় অনেকটাই মুখস্থ করতে হয় এবং সেখানে Logical memory থেকে Rote memory অনেকটা কাজ করে। বানান মুখস্থ করা, শব্দ অর্থ মুখস্থ করা, কবিতা মুখস্থ করা, ইতিহাসে সন-তারিখ, নামধাম মুখস্থ রাখা, ভূগোলের নামধাম মনে রাখা—এ সবে Rote memory কাজ করে। কিন্তু উপরের ক্লাসের পড়ার বিষয়ে যুক্তিবোধকে (reasoning) বেশি কাজে লাগাতে হয়। সেটা সাহিত্য পাঠ-ই হোক, ইতিহাস-ই হোক, বিজ্ঞান বা অঙ্ক-ই হোক। এবং যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বুঝে যে পড়া মনে রাখতে হয়, তাতে Logical memory বেশি কাজ করে। কাজেই তুমি, ক্লাসের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে পড়া বোঝার পর্বটি নিখুঁতভাবে শেষ কর। তারপর নতুন পড়ার সঙ্গে পুরনো পড়া নিয়মিত পর্বে পর্বে revise কর। দেখবে পড়া মনে থাকবে। লিখে লিখে পড়ার অভ্যাসটাও করবে। শুধু উপর উপর পড়ে গেলে পড়া সেভাবে মনে থাকে না। নিয়মিত প্রশ্ন-উত্তর লেখার অভ্যাস করবে।

তুমি লিখেছ, তোমার আর একটা সমস্যা, তুমি কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পার না। বন্ধুত্ব করতে গেলে, নিজেকে প্রসারিত করতে হয়। তুমি খোলামেলা মনে তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা কর। নিজেকে গুটিয়ে রাখলে বন্ধুত্ব হবে কী করে? খেলাধূলা করো কি? খেলার মাঠে তো বন্ধু হয়? সহমর্মিতা সমবেদনার মনোভাবটি সজাগ রাখ—বন্ধুত্বে তোমার মন ভরে যাবে।

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

ফোন ব্যবহার করে ফেলে দাও

আমেরিকার টেক্সাসে মিনিফোন ইনকরপোরেটেড (মিডল্যান্ড) তৈরি করেছেন ছোট্ট ডিসপোজেবল টেলিফোন। আমেরিকায় হাসপাতালগুলিতে প্রতিবছর তিন লক্ষরও বেশি লোক টেলিফোন ব্যবহারের মাধ্যমে স্টেফাইলকক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাস এবং পঞ্চাশ হাজার লোক যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হন। এই সংক্রমণ ঠেকাতে এখন হাসপাতালগুলিতে এই মিনি ফোন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মাত্র দু'ডলারে দশ মিনিট সময় পর্যন্ত কথা বলা যাবে। তারপর ফোনটি নষ্ট হয়ে যাবে। ব্যবহারের পর ফেলে দিতে হবে ফোনটি।

মিষ্টি মাপার যন্ত্র (সুইটমিটার)

বিভিন্ন শাকসব্জী কতটা মিষ্টি তা মাপার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন আমেরিকার কৃষিবিভাগের বিজ্ঞানী জেরাল্ড ডাল। পেঁয়াজের মিষ্টত্ব মাপার যন্ত্র তাঁর প্রথম আবিষ্কার। তাঁর আবিষ্কার চাষীদের উপকার করেছে। আগে চাষের জন্য উপযুক্ত পেঁয়াজ বীজ হিসেবে বাছাই করা হতো হাত দিয়ে দেখে, যা বেশ শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। বর্তমানে যন্ত্র অল্প সময়েই উপযুক্ত বীজ বাছাই করে দিচ্ছে।

ইনফ্রা রেডের মতো আলোকরশ্মি বিশেষ ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে পাঠালে তা পেঁয়াজের ভেতরে কতটা শুষ্ক বস্তু এবং কতটা জল আছে তা জানান দেয়। আর এই শুষ্ক বস্তুই নিরূপণ করে পেঁয়াজের মিষ্টত্ব। এই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে জেরাল্ড সুইটমিটার তৈরি করলেন। অ্যালুমিনিয়ামের একটি বাক্সে আলোক-বিচ্ছুরণ যন্ত্র রেখে তার মধ্যে পেঁয়াজ রাখা হয়। সেখান থেকে পাওয়া তথ্য কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। যন্ত্রটি মেরিল্যান্ডের ভেরেক্স কর্পোরেশন এখন বাজারে বিক্রি করছে। পেঁয়াজের ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার পর তৈরি হয়েছে তরমুজ এবং আলুর মিষ্টত্ব মাপার যন্ত্র। এখন তাঁরা চেষ্টা করছেন অন্যান্য সব্জীর মিষ্টত্ব মাপার যন্ত্র বের করতে।

পেশী থেকে আঠা

মাংসপেশীগুলি পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে জুড়ে থাকে বিশেষ আঠার মতো বস্তু দিয়ে। সে আঠা বাজারে প্রচলিত যে কোনো আঠার চেয়ে শক্তিশালী। দীর্ঘ দিনের গবেষণার পর আমেরিকার কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বিজ্ঞানী জে. হারবারট এই আঠার মতো বিশেষ বস্তুটিকে চিহ্নিত করেছেন এবং কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত করেছেন। বিভিন্ন শিল্পে, ঔষধ প্রস্তুতিতে এবং চিকিৎসার কাজেও এই আঠার ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। মাংসপেশীর আঠার মতো হারবারটের তৈরি আঠা পলিফেনোলিক প্রোটিন। এই প্রোটিন গঠিত হয় দশ ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড শিকলের মতো পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে। ভাঙা দাঁত ঠিক করতে এবং হাড় জুড়তেও এই আঠা ব্যবহার করা হচ্ছে।

সুতো ছাড়া কার্পেট

গৃহসজ্জার জন্য ইংল্যান্ডের পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের সিলভাস্টিম তৈরি করেছেন এক নতুন ধরনের কার্পেট, যার নাম সিলোপটিক (Siloptic)। অ্যাক্রিলিক অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে তৈরি হয়েছে এই কার্পেট। আলো কমবেশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্পেটের রং এবং ডিজাইনও বদলে যায়, সেভাবেই কার্পেটগুলো তৈরি করা হয়। সহজে ছেঁড়ে না এবং নোংরা হয় না এই কার্পেট। যেখানে যখন-তখন লোডশেডিং হয় সেখানে তো এই কার্পেট ব্যবহার করা খুব ভাল। কারণ কার্পেট থেকে বিচ্ছুরিত মৃদু আলো বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

হাঁদা-ভোঁদার

বড়দিনের উপহার

পরদিন-
দ্যাখ হাঁদা! পিসেমশাই আমাদের জন্যে বড়দিনের উপহার নিয়ে এসেছে।
আমি তোদের বড়দিনের উপহার এনেছি, এবার তোরা যেটা খুশি নে।
আমি এটা নেবো।
ঠিক আছে।
বুঝলি, গোঁদা! বাক্সোটা বেশ ভারী। ভেতরে বেশ ভালো জিনিসই আছে মনে হচ্ছে!
গদাম!
ওঁফ্!
ফাঁকি দিয়ে কাজ-কাম আর বেশী লোভের পরিণাম—হেঃ হেঃ!
মনে হয় পিসেমশাই তোর ফাঁকিবাজি ধরে ফেলেছে তাই তোকে একটু প্যাঁচ দিয়ে দিলো। খাবি নাকি?
মেলা কপচাসনি তো। দূর হ!

বাজিরাও—অদ্বিতীয়!

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

[শুকতারার বয়স ৫৪ বছর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে বাংলার যশস্বী সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই শুকতারায় লিখেছেন। 'ফিরে দেখা' বিভাগে আমরা শুকতারার পাতা থেকে এক এক করে তুলে আনবো বাংলা শিশুসাহিত্যের কিছু মণি-মাণিক্য। শুকতারার শারদীয়া সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে এই পর্ব। এই সংখ্যায় ছাপা হচ্ছে শিবরাম চক্রবর্ত্তীর লেখা হাসির গল্প 'বাজিরাও—অদ্বিতীয়'! গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল শুকতারার ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যায় অর্থাৎ আশ্বিন ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে। সঃ শুকতারা]

"আয়, একটা বাজি ধরা যাক্—" চীনে-বাদামের খোলা ভাঙতে ভাঙতে বল্লেন হর্ষবর্দ্ধন।

"বাজি রাখা ভালো নয়।" গোবর্দ্ধন বল্ল। খোলা-ভাঙা যে-বাদামটা দাদার আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেছল, সেইটা তুলে নিজের মুখে পুরে দিয়ে অম্লান-বদনে সে বল্ল।

"ভালো নয়, হ্যাঁ! ক'রকমের বাজি হয় জানিস্ তুই?"

"দু-রকমের। বাজি ধরা আর বাজি হারা।" বলতে বলতে দাদার হাতের পতনোন্মুখ আরেকটা বাদাম হাতাবার তার অপচেষ্টা।

"দু-রকমের বটে, তবে ও নয়। এক হোলো, গজবাজি। আরেক হোলো গিয়ে—"

"গজবাজি কী দাদা?" গোব্‌রা বাধা দিল।

"কী আবার! হাতী-ঘোড়া!...আর দুই হোলো গিয়ে—ডিগ্‌বাজি।"

"একই কথা। আমি যা বল্লাম তাই। বাজি ধরা আর বাজি হারা। জিততে পারলেই হাতী-ঘোড়া—আর হেরে গেলেই ডিগ্‌বাজি।"

গোল-দীঘির এক কোণে বসে হর্ষবর্দ্ধন একমনে বাদাম ভাঙছিলেন, আর তাঁরই পাশে মাঠের ঘাসে গা এলিয়ে গোব্‌রা দাদার বাদাম ভাঙা দেখছিল। কখন্ বেহাত হয়ে এক-আধটা ফস্‌কায়। দাদার চেয়ে বাদামের দিকেই তার নজর ছিলো বেশি।

"আয় একটা বাজি ধরা যাক্।" হর্ষবর্দ্ধন আবার বল্লেন।

"গজবাজি?" গোব্‌রা প্রশ্ন করলো। "সে এখানে কোথায়? ধরতে হলে এখন চিড়িয়াখানায় যেতে হয়। সে তুমিই ধরো গে দাদা, আমার গায়ে অতো জোর নেই। আর উৎসাহও নেই! তবে যদি ডিগ্‌বাজির কথা বলো তো আমি রাজি আছি। সে ধরবার জিনিষ নয়—খাবার জিনিষ। চীনে-বাদামের মতই খাওয়া যায়। খাবো?"

বাদামদের সাম্‌লে নিয়ে হর্ষবর্দ্ধন বল্লেন—"না না, সে-বাজি নয়। সে তোকে খেতে হবে না—চীনে-বাদাম, ডিগ্‌বাজি কিছু না। অনেক খেয়েছিস্, আর খাস্‌নে—পেট কাম্‌ড়াবে। আমি বল্‌ছি অন্য বাজির কথা। মনে কর্, আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম—তুই তার জবাব দিলি—না যদি পারিস্ হেরে গেলি। তারপর তুই আমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করবি—না পারলে আমি বাজি হারলাম।"

"ওঃ, হেঁয়ালি? তুমি হেঁয়ালির কথা বল্‌ছো?"

"তা, হেঁয়ালিও বলা যায়। কিন্তু দশ টাকা করে বাজি থাক্‌বে। যে জবাব দিতে পারবে না, বাজি হারবে, তাকে টাকাটা দিতে হবে।"

"বেশ, কিন্তু আমি হারলে তোমার অর্দ্ধেক দেব। আমার তো তোমার মত অতো বিদ্যে নেই।"

"বারে! আমার বিদ্যে বেশি কিসের? সে একই ফিফ্‌থ্ ক্লাশ অব্‌দি পড়া দুজনের—"

"তাহলেও আমি কি তোমার সমান? পড়াশোনায় হয়তো এক হলেও তুমি আমার চেয়ে কত বড়ো! আর কতো মোটা—সেটাও তো দেখতে হয়! বিদ্যে ছাড়া বুদ্ধি বলে একটা জিনিস নেই? তোমার বুদ্ধিও আমার চেয়ে বেশি হৃষ্টপুষ্ট নিশ্চয়ই। তাছাড়া, তুমি আমার কতো আগে জন্মেছো, কত বেশি দেখেছো শুনেছো! পড়াশোনাই কি সব? দেখা-শোনাটা কিছু নয়?"

"তা বটে।" ভাইয়ের প্রশস্তি শুনে হর্ষবর্দ্ধনের মুখপট—মুখ থেকে পেট পর্য্যন্ত—প্রশস্তি-হাসিতে ভরে গেল। "বেশ, তুই তাই দিস্—আদ্ধেকই দিস্! তুই তাহলে সুরু কর্। তোর ধাঁধাটাই শোনা যাক্ আগে।"

গোবর্দ্ধন একটু মাথা নাড়লো, তারপর বল্লো—"আচ্ছা, সেই জন্তুটা কী বলো দেখি দাদা, যে তিন পায়ে দৌড়য় আর দু পায়ে ওড়ে?"

হর্ষবর্দ্ধন দাড়ি চুল্‌কালেন, নাক সিট্‌কালেন, আকাশকে ভেংচি কাট্‌লেন। তাঁর ভুরু কুঁচকালো, ভুঁড়ি ফেঁপে উঠলো—কিন্তু জন্তুটার কোনো কিনারা পেলেন না। অবশেষে মুখ বিকৃত করে তিনি জানালেন—"না, পারা গেল না। এ যে কোন্ জানোয়ার আমার জানা নেই। তোর পাড়াটে বন্ধুদের কেউ যদি হয় তো বল্‌তে পারি নে। এখনো পাড়াপড়শীর সবার সঙ্গে তো আমার পরিচয় হয় নি! এই নে, তোর দশ টাকা। ধর্।"

এই বলে' পকেট থেকে কর্‌করে দশ টাকা বার করে' ঠনাঠ্‌ঠন্ গোব্‌রাকে গুণে দিলেন।—"এখন, উত্তরটা কী, বলো তো বাপু?"

"আমিও জানি না।" গোব্‌রা জবাব দিলো : "এই নাও তোমার পাঁচ টাকা।"

গোব্‌রাও বাজিয়ে দিলো। বাজির টাকা তো!

হেরে গিয়ে হর্ষবর্দ্ধন গুম্ হয়ে থাক্‌লেন খানিক। কিন্তু ঐ খানিকক্ষণ! তার পরেই আবার উদ্দীপনা তাঁর দেখা দিল—"চল্, আমরা সরবৎ খেয়ে আসি। চীনে-বাদাম চিবিয়ে চিবিয়ে শুকিয়ে গেছে গলাটা—একটু ভিজিয়ে নিয়ে আসা যাক্। চ।"

গোলদীঘির পূব্‌ধারে নামজাদা দুই সরবতের দোকান—প্যারাগন্ আর প্যারাডাইজ্—পাশাপাশি। রঙ-বেরঙের ঘোলের সরবৎ! একটু আগেই হর্ষবর্দ্ধন একরকমের ঘোল খেয়েছেন ভায়ের কাছে—বিষে বিষক্ষয়ের মত ঘোলে ঘোলক্ষয় করার ইচ্ছেটাও হয়ত তাঁর জাগছিল। টাকা পাঁচটা না ফিরে পাওয়া পর্য্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলেন না তিনি।

প্যারাডাইজের চেয়ারে বসেই তিনি বল্লেন—"দু' মিনিটের মধ্যে পর-পর পাঁচ গেলাস সরবৎ খেতে পারিস্ তুই?" এবার ভাইকে ঘোল খাওয়ানোর মৎলব চাপলো তাঁর মাথায়।

"যদি পারি? কী বাজি?"

"পাঁচ টাকা পাবি। না পারলে, ঐ পাঁচ টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। আড়াই টাকা দিলে শুনব না।"

গোব্‌রা একটু চুপ্ করে থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এলো মিনিট দুই বাদে।

"কোথায় গেছলি? জলবিয়োগ করতে বুঝি?" জিজ্ঞাসা হোলো দাদার।

"জলবিয়োগ—তার মানে?"

"মানে, জলযোগের আগে পেট খালি করতে গেছলি নাকি? কথ্য ভাষায় না বলে সাধুভাষায় বল্লাম কথাটা।"

"কিন্তু আমার প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করা কি তোমার উচিত? তুমি দাদা হয়ে—?" গোব্‌রা গোঁ-গোঁ করে।

"কোথায় গেছলি—তাই জানতে চাইলাম।"

"সে খোঁজে তোমার দরকার? সর্‌বৎ দিতে বলো। আর টাকা বার করো তোমার।"

বল্‌তে না-বল্‌তে পাঁচ গেলাস সর্‌বৎ গোব্‌রার সাম্‌নে এসে গেল। পাঁচ রকমের সরবৎ—রোজ্, ম্যাংগো, পাইন্-আপেল্, রাস্‌প্‌বেরি, ব্যানানা—পঞ্চ রঙের দৃশ্য। বড়ো-বড়ো ঢাউস্ গেলাস্ পাঁচটা যেমন রঙীন তেমনি সঙীন্!

গোব্‌রা চোখ বুজে সুরু করলো—দেয়াল-ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়েই। হর্ষবর্দ্ধনও নিজের হাতঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার প্রতি কড়া নজর রাখলেন।

দেখতে না-দেখতে গোব্‌রা পাঁচ গেলাস ফাঁক করে দিলো—তখনো দশ সেকেণ্ড তার হাতে। দু মিনিট পূরতে তখনো দশ সেকেণ্ড বাকী।

অবাক্ কাণ্ড। হর্ষবর্দ্ধন থ হয়ে গেছেন—"তুই! তুই—পাঁচ পাঁচ গেলাস্ সরবৎ—অ্যাঁ—"

কথ্য, অকথ্য কোনোরকম ভাষাই তাঁর যোগায় না! বিস্ময়ে ভাসেন।

"পারবো যে আমিই কি জান্‌তাম! পরীক্ষা করে—ফলেন পরিচীয়তে করে এলাম যে! দেখে এলাম একটু আগে।" গোব্‌রা বল্ল।

"তার মানে? কী দেখে এলি? কিসের পরীক্ষা?"

"খেতে পারবো কি না তার পরীক্ষা। তোমার কি, তুমি তো বাজি হেরে গিয়ে টাকা বাজিয়ে দেবে। কিন্তু আমি বাজি জিততে পারবো কি না সেটা তো আমার নিজেকে বাজিয়ে দেখতে হয়!"

হর্ষবর্দ্ধনের তবুও বোধগম্য হয় না। হাঁ করে থাকেন তখনো।

"দু-মিনিটে পাঁচ পাঁচ গেলাস সর্‌বৎ ওড়ানো—চালবাজি নয়,

গোবরা চোখ বুজে সুরু করলো।

চাট্টিখানি না। পারবো কি না কে জানে? খেয়ে দেখিনি তো কখনো! তাই একটু আগে পাশের প্যারাগনে গিয়ে পাঁচ গেলাস খেয়ে যাচিয়ে এলাম।"

প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই
ছাত্রছাত্রীরা লুফে নিয়েছে

বাংলায় লাখ কথার এক কথা হল বাগ্‌বিধি বা প্রবাদ-প্রবচন। বাচ্য অর্থকে ছাড়িয়ে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনাকে তা অতিক্রম করে অর্থে আনে আশ্চর্য চারুতা। তাই বিশিষ্টার্থক বাগ্‌গুচ্ছ, বাগ্‌ধারা বা প্রবাদ-প্রবচন ভাষার আত্মা। পরীক্ষার্থীর পাঠসূচিতেও এই বাগ্‌ধারা অন্তর্ভুক্ত...

কৌতূহলী ছাত্রছাত্রী বা সাধারণ পাঠকও এই বইটি ব্যবহারে উপকৃত হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ছাত্রছাত্রীরা তো উপকৃত হবেই, বইটি সাধারণ পাঠকের কাছেও সমাদৃত হবে।

জ্যোতিভূষণ চাকী

বাগ্‌ধারা সংগ্রহ ২০

সংকলন ও সম্পাদনা : শৈলেন চক্রবর্তী

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা) লিমিটেড

বাঘা, মটরু এবং তিনি

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

সাহেব বলে কথা। হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। দোর্দণ্ডপ্রতাপ—বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। কথা বলতে গেলে লোকের জিভ জড়িয়ে আসে। বুক সাহেবকে তখন কে না চেনে?

আর বেলুড়মঠ তো তাঁর এলাকা। বৃটিশ রাজত্বের তিনি এ অঞ্চলের প্রতিনিধি। আইন-শৃঙ্খলার ভার সাহেবের উপর।

মঠের কথা ভাবলেই কিন্তু তাঁর মনটা নরম হয়ে যায়। কী আছে ওখানে? কেন এত ভক্তের ঢল? বিশ্বজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের নাম শুনেছেন। বিদেশ থেকে ফিরে এখন ওখানেই। ভাবলেন যাই একবার দেখে আসি। কথাবার্তায় ঝালিয়ে নিই, বাজিয়ে নিই!

মস্ত বড় পোস্টের কাজ। শুধু গেলেন আর ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ালেন তা হয় নাকি। বুক সাহেব কেতাদুরস্ত লোক। আগাম খবর না দিয়ে কোথাও যান না।

কিন্তু কপালে না থাকলে যা হয়। যতবার ঠিক করেন ততবারই নানা ঝুটঝামেলা। কাজকর্মের ফাঁসে সময় ফস্কে যায়। রাত্তিরে যাওয়া তো যায় না। মঠের নিয়ম-কানুন দারুণ কড়া। তাছাড়া সূর্য ডুবলেই চারদিকে ঘন অন্ধকার। হারিকেনের আলো—লাইট আসেনি। চারদিকে ঝোপ-ঝাড়, কাঁটাগাছের জঙ্গল। সাপখোপের রাজত্ব। গঙ্গার পাড়ে অজ পাড়াগাঁয়েরও অধম। সাপের ভয় আছে সাহেবের।

মঠের তখন দারুণ আর্থিক অনটন। সন্ন্যাসীদের পেট ভরে খাওয়াই জোটে না—ভেতরের রাস্তাঘাটের অবস্থাও তেমনি জরাজীর্ণ। না আছে কোনো ফটক বা প্রাচীর। কোনো রকমে সীমানা শেষে কাঁটাতারের বেড়া।

মঠে ঢুকতে গেলে খেয়াঘাটের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে হতো। ঘোরানো কাঠের দরজা পেরিয়ে তারপর ভেতরে। দুপুরের দিকে লোকজন কম—জিজ্ঞেস করেও ঢোকার রাস্তার কথা বোঝা দায়। ঐ কাঠের দরজাই বলতে গেলে ফটক। প্রবেশদ্বার।

(দুই)

বুক সাহেবের আসা আর হয়ে ওঠে না। খবর দিয়েও সময় বার করতে পারেন না।

কেউ কেউ বললো, সাহেব তোমার ইচ্ছায় যাওয়া হবে না।

কেন?

ওটা ভগবানের জায়গা। তাঁর রাজত্ব। দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগলা বামুন এখনো আছেন। সারা দিন-রাত নাকি ঘুরে বেড়ান। তিনিই সব। লর্ড রামকৃষ্ণ। তিনি চাইলে তবে যেতে পারবে। তাঁর ইচ্ছাই সব।

মানে?

হ্যাঁ, লর্ড জিসাসের মতো। স্বর্গরাজ্যের প্রবেশাধিকারের চাবিকাঠি তাঁর হাতে। বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য।

তাহলে? কথাটা শুনে ধন্দে পড়ে গেলেন সাহেব।

প্রার্থনা কর, প্রে করো। লর্ডের কাছে আর্জি জানাও। তোমার কাজ শেষ করে নয়, আগেভাগে সেখানে যাও। ফিরে এসে অন্য কাজকর্ম।

কথাটা মনে ধরলো সাহেবের। অনেক চিন্তা করলেন। একদিন কী যে হলো খবর না দিয়ে হঠাৎ এসে হাজির। তখন ভর দুপুর। চারদিক নির্জন, নিঝুম।

ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেই ঘোরানো দরজা। দরজার অপর দিকে দাঁড়িয়ে আছে একটা কুকুর আর একটা সারস পাখি।

না, সাহেবকে দেখে তাদের কোনো ভয়ডর নেই। ভেতরে ঢুকে গেলেন উনি।

ঢুকতেই একপাশে কুকুর আরেক পাশে সারস পাখি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো। থমকে দাঁড়ালো অভ্যর্থনার ভঙ্গিমায়। যেন দুটো 'পাইলট কার'—ভি. আই. পি'রা যখন চলেন তখন ঐ গাড়িই পথ দেখায়।

ওদের কেউ বলেনি। কিন্তু সাহেবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অপর প্রান্তে—স্বামীজীর ঘরের দিকে।

(তিন)

সত্যি বলতে কি স্বামীজী সাহেবকে দেখে অবাকই হয়ে গেলেন। সাহেবের কাছে সব শুনলেন। গুরুগম্ভীর মুখে হাসি আর ধরে না। ইংরেজিতে বললেন, তোমার নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়েছে, তোমাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারিনি।

স্বামীজীকে দেখে সাহেব মন্ত্রমুগ্ধ—কী চেহারা! দারুণ চোখ দুটো—সব সময় আগুন জ্বলছে। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না।

বললেন, না স্বামীজী, আমি জীবনে কোনোদিন এমন সুন্দর অভ্যর্থনা পাইনি।

স্বামীজী হাসতে আরম্ভ করলেন। শিশুর মতো হাসি। হাসি থামতেই চায় না, যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন।

(চার)

জানি, তোমাদের এখন সেই সারস পাখি আর কুকুরের কথা জানতে ইচ্ছে করছে। অবাক হয়ে ভাবছো ওরা কি করে মঠে এলো!

ওরা তো ঠাকুরের ভক্ত—স্বামীজীরও। তা না হলে কী সেই স্বর্গরাজ্যে জায়গা হয়?

স্বামীজী ওদের খুব ভালবাসতেন। সারস পাখি, কুকুর, আর ছিল আরেকটা ছাগল।

নাম দিয়েছিলেন সেই কুকুরের—বাঘা, ছাগলকে ডাকতেন মটরু। বাঘা এবং মটরুকে রোজ না দেখলে মনই তাঁর খারাপ হয়ে যেত। নাম ধরে ডাকলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে ডানা ঝাপটে সারসটাও এসে হাজির হতো—একজনকে ডাকলেই তিনজন।

ঐ তিনজনই স্বামীজীর পরম ভক্ত।

একবার সারস পাখিটার ঠাণ্ডা লেগে সর্দিজ্বর হলো। বেচারা কাবু হয়ে গেল—গলার সেই তেজ নেই, ঝিম মেরে থাকে।

কী মন খারাপ স্বামীজীর! ছোটাছুটি শুরু করে দিলেন। কী হবে? পাখিটার কী হবে? স্বামীজীর মন খারাপ মানেই আশ্রমের সকলেরই মুড অফ। সবাই দৌড়াদৌড়ি করে ডাক্তার নিয়ে এলো। পশুপাখির ডাক্তার। কত যত্ন, কত চিকিৎসা—নিয়ম করে ওষুধপত্তর খাইয়ে পাখিটা সেরে গেল। মুখে হাসি ফুটলো স্বামীজীর।

আর সেবার কী গরম কী গরম! সূর্যের তেজে বাতাসে যেন আগুনের হলকা। অত্যধিক গরমে আদর-যত্নে থাকা মটরুর অবস্থা কাহিল। সেই সঙ্গে স্বামীজীর মনে মটরুর জন্য কষ্ট। আবার ছোটাছুটি—ডাক্তার। রীতিমতো রাজার আদর! ঠাণ্ডা সরবত, কত রকমের ওষুধ, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘরে থাকার ব্যবস্থা। ভালো হয়ে গেল মটরু—স্বামীজীর মনটাও তখন বেশ হাসিখুশী।

ওরা স্বামীজীর ভক্ত আগেই বলেছি। স্বামীজী বেড়াতে বেরোলে ঐ তিনজনের আনন্দ আর দেখে কে? একসঙ্গে পাশে পাশে থাকতো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। শুরু হয়ে যেত লাফ-ঝাঁপের প্রতিযোগিতা।

ওদের নিজেদের মধ্যে ভাবও ছিল দেখবার মতো। কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারতো না। একজনের অসুখ হলে আর দুজন সামনে বসে থাকতো চুপটি করে। মন খারাপ করতো—দেখাশোনা করতো। পাখিটা তার ঠোঁট দিয়ে আদর জানাত, বাঘা থাকতো পাহারায়। মটরু ঘাস, পাতা নিয়ে আসতো। পশুপাখিরা জানে কোন লতাপাতায় শরীর সারে।

ওদের জন্য বাইরের কোনো জানোয়ারের উপায় নেই মঠে ঢোকার। তিনজনই একসঙ্গে তাড়া করতো, সীমানার বাইরে ভাগিয়ে দিয়ে তবে যেন নিশ্চিন্ত। কিন্তু কোনো দিন কারো অনিষ্ট করেনি।

(পাঁচ)

একদিন রাত্তিরে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে স্বামীজী বাঘার গলায় পা দিয়ে ফেললেন। তখন গভীর রাত। স্বামীজী বুঝতে পারেননি বাঘা দরজার সামনে শুয়ে আছে।

বুঝতে পারার কথাও নয়। বাঘা কোনোদিনই তাঁর ঘরের সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে না। কুঁই কুঁই গোঙানির শব্দে বুঝতে পারলেন বাঘা।

এত রাত্তিরে বাঘা কেন?

ঠিকই বুঝতে পারলেন বাঘাকে কেউ মেরেছে তাই নালিশ জানাতে এসেছে প্রভুর কাছে।

স্বামীজী ক্ষেপে লাল, বাঘাকে কে মারলো! পরদিন সবাইকে ডাকলেন।

তোমরা নিশ্চয়ই বাঘাকে কেউ মেরেছো, তাই আমার কাছে এসেছিল। নালিশ করেছে। খবরদার খেলার ছলেও ওর পেছনে লাগবে না। আমাদের মতোই ওর ভেতরেও ভগবান আছেন। তিনি কষ্ট পাবেন। সেটা কি উচিত?

ব্যস সবাই চুপ, সকলের মুখ বন্ধ। বাঘা খুব খুশি, নিচ থেকে ঘেউ ঘেউ করে আনন্দে ডেকে উঠলো।

অনেকদিন বেঁচেছিল স্বামীজীর বাঘা। মরে যাবার পর বাঘাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হলো।

কিন্তু ফিরে এলো বাঘা। ভাটার সময় জলের তোড়ে মঠে। নিজের জায়গায়—স্বর্গরাজ্যে।

আবার জোয়ার আসতে বাঘাকে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। সবাই তখন নিশ্চিন্ত। যাক গঙ্গার পবিত্র জলে সলিল সমাধি।

কিন্তু কী আশ্চর্য! আবার বাঘা এসে হাজির—ভাটার টানে মঠে। স্বামীজীর জায়গা ছেড়ে, প্রভুকে ছেড়ে যেতেই চাচ্ছে না। চাইবে কেন? বাঘা যে মঠেই থাকতে চায়।

শেষ পর্যন্ত মঠেই চন্দন গাছের কাছে গর্ত করে বাঘাকে থাকার জায়গা করে দিলেন বাবুরাম মহারাজ। হ্যাঁ, এখনও সে জায়গায় শুয়ে আছে বাঘা।

মজিলপুর কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়। মজিলপুরের বোসপুকুরপাড়ায় থাকে তিন সত্যসন্ধানী— শান্ত, মোটু ও শেলী। মজিলপুরে কোন বড় ধরনের চুরি ডাকাতি হলে ওরা তদন্তে নামবে ভাবে। কিন্তু তেমন কিছু হচ্ছে না।

সেদিন রাতে গগনবাবুর লাইব্রেরীঘরে আগুন লাগল। ত্রয়ী সত্যসন্ধানী ছুটল আগুন দেখতে। পুলিশ বটেশ্বর খুব মাতব্বরি করছিল। ত্রয়ী এবার নামল আগুন লাগার কারণ সন্ধানে।

সেই অভিজ্ঞতার বিচিত্র কাহিনী—

পোড়াবাড়ির রহস্য ২০

অনিল ভৌমিক

এই তিন সত্যসন্ধানীর আর একটি অভিযান

একটি ঘরের রহস্য ২৫

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা) লিমিটেড

চিঠিপত্র

(মতামতের দায়িত্ব সম্পাদকের নয়)

পুরস্কৃত সেরা চিঠি

পথ দেখাবে সঙ্গীত

ছোটবেলায় ভালোলাগা থেকে ভালোবাসা আমার সঙ্গীতে। এই বিদ্যা সামান্য অর্জনের অভিজ্ঞতা থেকেই আমার এই লেখার অবতারণা। এখানে আমি সঙ্গীতের আবেগমিশ্রিত আনন্দ উপলব্ধির দিকটাতে নয়, এর ব্যবহারিক দিকটার প্রতিই আলোকপাত করছি। বর্তমানে শিশুমনকে সুস্থ রাখার জন্যে শিশুকাল থেকে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের সংযোগ স্থাপন বোধহয় অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কারণ আধুনিক যুগে প্রচার মাধ্যমের দ্বারা যে বিষয়বস্তুগুলি অধিক গুরুত্ব প্রাপ্ত ও নবশতকের প্রতিটি শিশুর নিকট উন্মোচিত তা থেকে অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা ও সর্বোপরি হিংস্রতারই তারা শিকার হয়ে পড়ছে। তাই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অনিশ্চয়তা ও নিঃসঙ্গতা আসতে বাধ্য। একমাত্র সঙ্গীতই পারে তার সুর, তাল, কথা ও ভাবের সম্মিলিত রূপ নিয়ে একটি শিশুমনের গভীরে পৌঁছুতে, তার কোমল রিপুগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে প্রকৃত 'মানুষ' হিসেবে গড়ে তুলতে। আসুন আমরা সকলে মিলে নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠক্রমে সঙ্গীতকে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে দাবি জানাই। যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের দুর্বোধ্য বিষয়গুলোকে সঙ্গীতের অনাবিল আনন্দের মোড়কে স্থাপন করে সহজে গ্রহণ করতে পারে।

সুপ্রিয়া দাম

(প্রযত্নে—তড়িৎ দাম, ৬/সি, গোমেশ লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৪)

ভূতের মজা

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সুবিমল সোমের 'ভূতের মজা' ও অপূর্ব কুমার কুণ্ডুর 'আড়ি' ছড়া দুটি খুব ভালো লেগেছে। এই রকম ছড়া আরও ছাপুন। ফিরে দেখা ও মনের জানলাও ভালো লাগে।

মন্দিরা মহাপাত্র

(পাঁশকুড়া)

পিশাচের রাত

শারদীয়া সংখ্যায় অনীশ দেবের 'পিশাচের রাত' ও শক্তিপদ রাজগুরুর 'পটলাকে নিয়ে প্রবলেম' উপন্যাস দুটি অনবদ্য। গল্পের মধ্যে 'যাদুকর', 'যুদ্ধবাজরা নিপাত যাক', 'গণেশের মূর্তি', 'চ্যাচু' গল্পগুলি ভালো লেগেছে। কবিতা, ছড়াগুলিও দারুণ।

কৌশিক বক্সী

(রবীন্দ্রপল্লী, সিউড়ি, বীরভূম)

লাহা প্যালেসের রহস্য

শারদীয়া সংখ্যায় প্রফুল্ল রায়ের 'লাহা প্যালেসের রহস্য', হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের 'ভৌতিক চশমা', হিমানীশ গোস্বামীর 'জীব্রামের খাদ্য বিচার' গল্পগুলি আমার খুব ভালো লেগেছে। হাসি ও গোয়েন্দা গল্প আরও বেশি করে চাই।

শাক্য সিংহ

(১০৩/২/ই, বিষ্ণুপুর রোড, মধুপুর, বহরমপুর-৭৪২১০১, মুর্শিদাবাদ)

ভুতুড়ে বাড়ির রহস্য

অজেয় রায়ের লেখা ভৌতিক গল্প 'ভুতুড়ে বাড়ির রহস্য' খুব ভালো লেগেছে। ভূতের গল্পগুলি আর একটু ভয়-ভয়ের হলে ভালো হয়।

মিতালী দাস

(বুলবুল চটি, খড়গপুর, মেদিনীপুর)

দুটো বাঁটুল

হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল দি গ্রেট খুব ভালো লাগে। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দুটো বাঁটুল দি গ্রেট পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেলার বিষয়ে লেখা খুব ভালো লাগে। ছবিগুলো আরও ভালো হওয়ার দরকার। খেলার নতুন ছবি দিন।

অভিজিৎ দাস

(বিধান শিশু সরণী, পুলিশ হাউসিং কমপ্লেক্স, ব্লক-এ-২, রুম-৩০৩, কলকাতা-৭০০ ০৫৪)

আর্মস্ট্রঙের চন্দ্রজয় প্রসঙ্গে

শারদীয়া সংখ্যায় নারায়ণ সান্যালের 'আর্মস্ট্রঙের চন্দ্রজয় কি বিরাট মার্কিন ধাপ্পা' পড়ে খুশি হয়েছি। এই বিষয়ে আমি আরও বিস্তারিতভাবে জানতে চাই। আর কি ছাপা হবে?

সৌমি ভট্টাচার্য

(প্রযত্নে—বিক্রমাদিত্য ভট্টাচার্য, ৩ ভবানী ঠাকুর লেন, রাজবাড়ি, উত্তর ফটক, বর্ধমান)

মানিকমামাকে যেমন দেখেছি

শারদীয়া সংখ্যায় ভীষ্ম গুহঠাকুরতার 'মানিকমামাকে যেমন দেখেছি' প্রবন্ধটি পড়ে ভালো লাগল। কিন্তু একটা ভুল চোখে পড়েছে। 'অভিনেত্রী' পরশুরামের লেখা নয়, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিখ্যাত গল্প।

শৈবাল চক্রবর্তী

(১৬ কালীবাড়ি লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৩১)

সেরা চিঠি

'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় শুকতারার পাঠক-পাঠিকারা যে কোনো বিষয়ের ওপর (রাজনীতি বাদ দিয়ে) চিঠি লিখতে পারে। সেরা চিঠিটি শুকতারায় ছাপা হবে এবং তার জন্যে একাশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আনুমানিক একশো শব্দের মধ্যে চিঠি লিখতে হবে। যত খুশি চিঠি পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে নিচের কুপনটি থাকা চাই। কুপন ছাড়া কোনো চিঠি গ্রাহ্য হবে না। সেরা চিঠি মনোনয়নের ব্যাপারে শুকতারার সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। চিঠি পাঠাতে হবে সম্পাদক শুকতারার নামে। খামে বা ইনল্যান্ডের ওপরে 'সেরা চিঠি' লিখে দিতে হবে।

আমি শুকতারার 'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় আমার মনোনীত বিষয় নিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠির মতামত সম্পূর্ণ আমার।

স্বাক্ষর (পুরো নাম) .....

সম্পূর্ণ ঠিকানা

* কল্যাণী মৈত্র স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প *

ভাঁটার টান

সৌরভ কুমার ভূঞ্যা

'বাপি তুমি যা বলেছ, সত্যি?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে সুবিনয়বাবুর বুক চিরে। বলেন—

'জানিরে মা, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। তবু এটাকেই আজ সত্য বলে মেনে নিতে হবে।'

'বাপি আমি এখনো ভাবতে পারছি না যে তুমি যা বলছ সত্য। দাদু মারা যাওয়ার পর যে কাকুকে তুমি পড়িয়ে মানুষ করেছ, চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছ, আর আজ সেই কাকু.....'

'দেখ মা, যা করেছি আমার কর্তব্যবোধে করেছি। ওরা আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছে সেটা ভেবে দেখিনি কখনো। ওসব কথা বাদ দে। আমার ভালো লাগছে না।'

হাতের কাছের খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে তার আড়ালে মনের দুঃখটাকে লুকোতে চেষ্টা করেন তিনি। এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়ান ভাই সুকোমল।

'দাদা।'

'কে, ও কমল, আয়। বোস।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে সোফার উপর বসেন সুকোমলবাবু। মামন বেরিয়ে যায়। সুবিনয়বাবু প্রথম মুখ খোলেন—

'কী ব্যাপার, কিছু বলবি মনে হচ্ছে?'

'দাদা, আগামী মাস থেকে আমরা ফ্ল্যাটে চলে যাচ্ছি, তুমি থাকছো, জায়গা-জমির যা কিছু করার তুমি করে ফেল।'

কথাটা শুনে সুবিনয়বাবুর বুকটা ধড়াস করে ওঠে। মুখ দিয়ে কোনো কথা সরে না। যন্ত্রণায় হৃদয়টা কুঁকড়ে যেতে থাকে। মনে পড়ে যায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত বাবার হাত ছুঁয়ে শপথের কথা—যে কোনো অবস্থায় তিনি দু'ভায়ের সংসারে ভাঙন ধরতে দেবেন না। সেদিন কমল ছিল ছোট্ট কিশোর। লতার মতো দাদাকে জড়িয়ে সে বাঁচার স্বপ্ন দেখত। অতীতের সেই ভালোবাসার বন্ধন যে বর্তমানে এত ঠুনকো হয়ে যাবে তা তিনি ভাবতে পারেননি। বুঝতে পারেন বুঝিয়ে আর কোনো কাজ হবে না, বরং ভাই আরো বেশি ভুল বুঝবে। তবুও কোনোরকমে একবার বলেন—

'কমল, আমি তোকে আর একবার ভাবতে বলছি।'

'আর কিছু ভাবার নেই দাদা। অনেক ভেবেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'কমল, আমি যে বাবার হাত ধরে কথা দিয়েছিলাম।'

'ওসব ছেঁদো কথা রাখো দাদা। আমার মনে হয় তুমি আমার উন্নতি সহ্য করতে পারছো না।'

'কমল।'—এরকম কথা যে কোনোদিন শুনতে হবে ভাবতে পারেননি সুবিনয়বাবু। তিলতিল করে নিজেকে নিংড়ে যাকে তিনি এত বড় করে তুলেছেন তার মুখে এতবড় কথা শুনে তাঁর মনে হয় বুকে যেন কেউ ছুরি বিঁধিয়ে দিয়েছে। কিছু না বলে চুপ করে থাকেন তিনি। কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে উঠে যান সুকোমলবাবু।

জিনিসপত্র প্রায় গোছানো হয়ে গেছে। টুকটাক যা কিছু আছে তাই নিয়ে ব্যস্ত সুকোমলবাবু ও তাঁর স্ত্রী। দুই ভাই অর্ঘ্য ও টুকাই বিরস বদনে বসে। জ্যেঠু আর মামন দিদিকে ছেড়ে যেতে তাদের মন চাইছে না। কিন্তু নিরুপায়—তাদের ভালো লাগা না লাগার কোনো মূল্য নেই বাবা-মায়ের কাছে। পড়াশুনা থেকে শুরু করে ভালো লাগা—বাবা-মায়ের চাপিয়ে দেওয়া বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে হবে তাদের। তাদের ইচ্ছের কোনো মূল্য নেই। দাদার পড়ে থাকা ভিডিও গেমটা নিয়ে আনাড়ির মতো বোতামগুলো টিপছিল টুকাই। তা দেখে অর্ঘ্য বলল—'টুকাই ওটা রেখে দে, নষ্ট হয়ে যাবে।'

'নষ্ট হবে কেন? একটু দেখছি, রেখে দেব।'

'না, তোকে দেখতে হবে না, রেখে দে।'

টুকাই ভিডিও গেম রাখবে না, অর্ঘ্যও তাকে দেবে না। দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। তা দেখে তাদের মা বলেন ঝগড়া না করে চুপ করে থাকতে। মায়ের বকুনিতে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে তারা। তারপর আবার তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। রেগে টুকাই ভিডিও গেমটা ছুঁড়ে দেয়। অর্ঘ্য রেগে যায়। সে টুকাইকে মারতে এগিয়ে আসে। এতক্ষণ নীরবে সব দেখছিলেন সুকোমলবাবু, কিন্তু এবার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না। উঠে এসে টুকাই-এর গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেন।

'বাপি তুমি আমায় মারলে!'

'বাঁদরামো করলে আরো মার খেতে হবে।'

'আমি কি করেছি?'

'দাদা তোমার চেয়ে বড়। তোমার দাদার কথা শোনা উচিত। তা না করে তুমি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করছ, তার কথার অবাধ্য হচ্ছ।'

'তুমিও তো তোমার দাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছ, তাঁর কথার অবাধ্য হয়েছ!'

'ছোট মুখে বড় কথা'—আরেকটা চড় মারতে গিয়েও থমকে যান সুকোমলবাবু, ধীরে ধীরে হাতটা নামিয়ে নেন। তাঁর হৃদয়ের মধ্য থেকে কে যেন বারে বারে বলতে থাকে—'সুকোমল, ছোট ছেলের মুখে নিজের রূপ দেখে উত্তেজিত হয়ে পড় না। নিজেকে শোধরাতে শেখ। ও কিছু ভুল তো বলেনি। দাদাকে যে শ্রদ্ধা করতে হয়, মানতে হয় সে দৃষ্টান্ত কি তুমি তোমার ছেলেদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছ? নিজের বিচার করো আগে। ওরা তাহলে আপনা থেকে শুধরে যাবে। তা না হলে ওদের মধ্যে কোনো কিছু ঘটলে তার জন্য চিরকাল দায়ী রইবে তুমি—হ্যাঁ তুমিই।' চমকে ওঠেন সুকোমলবাবু।

বাবা-মেয়েতে ঘরে বসে নিজেদের দুঃখের কথা আলোচনা করছিল। সুবিনয়বাবুর মনের মধ্যে তোলপাড় চলছে। তবুও অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছেন। মা-মরা মেয়েটার মুখের দিকে চাইতে পারছেন না। মামন এবছর উচ্চমাধ্যমিক দেবে। দেখতে দেখতে ও বড় হয়ে উঠবে। ওর বিয়ে দিতে হবে। তারপর, এই ফাঁকা ঘরে তাঁকে একেবারে একা থাকতে হবে। অনেক আশা ছিল, দু'ভাই একসঙ্গে থাকবেন। ভাবতে থাকেন তিনি তো কোনো অন্যায় করেননি। ভায়ের অনেক দোষ তিনি মাফ করে দিয়েছেন, অথচ তাঁর জন্যই কিনা এমন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে ছিল! বুক থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। এমন সময় সকলকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকেন সুকোমলবাবু।

'আয় কমল, বস। বস বৌমা। জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে তো?'

কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে থাকেন সুকোমলবাবু। সুবিনয়বাবু পুনরায় বলেন, 'নতুন জায়গায় যাচ্ছিস, সাবধানে থাকবি, ছেলেগুলোর দিকে নজর রাখবি। কখনো কোনো অসুবিধা হলে আমায় জানাস।.....কিরে আমিই শুধু কথা বলে যাচ্ছি। তুই কোনো উত্তর দিচ্ছিস না কেন?'

ধীর পায়ে দাদার দিকে এগিয়ে গিয়ে দাদাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাভেজা গলায় সুকোমলবাবু বলেন, 'দাদা আমায় ক্ষমা কর, তোমায় দুঃখ দিয়ে আমি ভুল করেছি।'

সুবিনয়বাবুর চোখ দুটোও জলে ভিজে ওঠে। বলেন, 'নারে ভাই। আমি কিছু মনে করছি না। কাঁদিস না আর। যাওয়ার সময় কাঁদতে নেই।'

'দাদা, আমরা তোমায় ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। আমি না বুঝে তোমায় দুঃখ দিয়েছি, তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও।'

প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না সুবিনয়বাবু। যখন বুঝলেন সত্যি সত্যি ভায়েরা যাচ্ছে না, তখন তাকে বুকে জাপ্টে ধরেন। কিছু বলতে পারেন না। কেবল চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে। বুঝতে পারেন—যৌথ পরিবারে কাউকে না কাউকে সহনশীল হতে হয়, তা না হলে সংসারের বাঁধন অটুট থাকে না। সকলের চোখ জলে ভিজে ওঠে। শুধু অর্ঘ্য আর টুকাই হাত ধরাধরি করে নাচতে থাকে আর তা দেখে হেসে ফেলে মামন।

কল্যাণী মৈত্র স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

তিন বউ

শিপ্রা ভৌমিক

ওঃ অসহ্য। এত জোরে টিভি চালালে দীপ পড়বে কী করে বলো তো! কতদিন ছোট্‌ঠাকুরপোকে বলেছি, বোকা বাক্সটাকে একটু আস্তে কথা বলা শেখাতে! পাশাপাশি ঘর। এ ঘরে নিঃশ্বাস ফেললে ও ঘরে শোনা যায়। আর এ তো একেবারে ডেসিবেলের গুণ্ডামি। আজ একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বো!—কোমরে কাপড় জড়িয়ে উঠে পড়ে এ বাড়ির সেজো বউ, দীপের মা বুলবুল। অমনি সেজোকর্তা তরুণকুমার বুলবুলের আঁচলটা টেনে ধরে।—দেখো মাথা গরম করলে আরো বড় ঝামেলা পোয়াতে হবে। জানোই তো আমার রোজগার কম। এ সংসারে আমিই সব থেকে কম দানাপানির যোগানদার। ছোট ভাইটার আর যাই হোক, টাকা খরচের হাতটা এখনও বেশ লম্বা। ভাগ্যিস বিয়ে-থা হয়নি। তুমি দীপের কাছে বোসো। আমি ওর কালার টিভিতে ফুটবল খেলা দেখার ছল করে, শব্দ কমানোর গোলটা দিতে পারি কিনা দেখি!

কী রে ছোট, খেলাটেলা হচ্ছে নাকি!—এই বলে সেজোকর্তা ছোট ভাইয়ের ঘরে ঢোকে।—ও, ডিসকভারি চ্যানেল দেখছিস!

—বোসো সেজদা, বোসো! খবরের কাগজগুলো সরিয়ে ঐ সোফাটায় বোসো।—ফুটবল দেখবে? দাঁড়াও, চ্যানেলটা বদলে দিই।

—এই ছোট, তোর রিমোটটা আমাকে একটু অপারেট করতে শিখিয়ে দিবি? কী ভাবে চ্যানেল পাল্টাতে হয়, সাউন্ড কমাতে বাড়াতে হয়, এসব জেনে রাখা ভালো।

ছোট ভাই, সেজদাকে রিমোটের অ-আ-ক-খ শেখাতে শুরু করে। এই ফাঁকে সেজদা চুরি করে টিভির সাউন্ডটা আগের থেকে অনেকটা কমিয়ে দিয়ে খেলা দেখার মগ্নতার ভান করে। পাশের ঘরে বুলবুল ও দীপের চোখে-মুখে হাসিফুল ফোটে। দীপ পড়তে শুরু করে—কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি.....।

বুলবুল কাছে না বসে থাকলে, দীপ একদম পড়ে না। কিন্তু সারাদিন ক্লান্তির পর বুলবুল আর বসে থাকতে পারে না। ও দীপের পাশে শুয়ে পড়ে এবং ঘুমিয়েও পড়ে।

দীপ চেয়ে দেখে, মা ঘুমোচ্ছে। এই মহাসুযোগকে ও হাতছাড়া করে না। পা টিপে টিপে ও মেজোজেঠিমার ঘরে ঢুকে পড়ে। জেঠতুতো দিদি রুনাও তখন পড়ায় ব্যস্ত। ক্লাস এইটের ছাত্রী। পড়ার চাপও বেশি। রুনা যেন দীপকে চিনতেই পারে না।

মেজোজেঠিমা চোখ পাকিয়ে বলেন, দীপ, এখন ঘরে যাও! রুনাদি পড়ছে। তুমিও পড়গে! দীপ বলে, আমার পড়া হয়ে গেছে। আর পড়তে ভালো লাগছে না। জেঠিমা আবার বলেন, যাও বলছি! দীপ মুখে মুখে তর্ক করে ওঠে, যাবো না!—যাও!

মেজোজেঠিমা দীপের কথা শুনে খুব রেগে যান। দীপের হাত ধরে তিনি বুলবুলের কাছে টেনে নিয়ে আসেন। গলা চড়িয়ে বলেন, ছেলেকে একটু আটকে রাখতে পারো না? রুনার পড়ার সময় ও যেন আমার ঘরে না যায়!

চেঁচামেচিতে বুলবুলের ঘুম ছেড়ে যায়। তারপর মেজজায়ের অভিযোগ শুনে, সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে দীপের উপর। মেজজা ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া মাত্রই দীপের কান মুচড়ে, গালে জোরসে কটা চড় কষিয়ে দেয়। দীপ গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করে।

ওর কান্না শুনে আবার মেজোজেঠিমা ছুটে আসেন। ও কি সেজো, উচিত কথা বলেছি বলে ঐ দুধের শিশুটাকে অমন করে মারলে?

বুলবুল ফুঁসে ওঠে, বেশ করেছি! আমার ছেলেকে আমি মারব ধরব যা খুশি তাই করব। মেজোবউ কেঁদে ফেলেন, ছেলে তোমার একার নয়, সেজো! দীপ এ বাড়ির ছেলে। আমার ছেলে নেই বলে, আমি ওকে ছেলের মতোই ভালোবাসি। আর ভালোবাসি বলেই শাসনও করতে পারি।

বুলবুল এবার ফণা নামায়। তার মনে পড়ে দীপের জন্মের পর থেকে প্রায় দু'বছর বয়স পর্যন্ত মেজদিই দীপের সবকিছু করতেন। বুলবুল তখন জনডিসের রোগী। কুটোটি নাড়তে পারতো না। খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, নাওয়ানো সব কিছুতেই মেজোজেঠিমা! সেই মেজদি যদি আজ দীপকে একটু বকুনি দেন, তাহলে দোষের কী আছে!

প্রকাশিত হল

অরূপরতন ভট্টাচার্য সম্পাদিত

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার একটি প্রামাণ্য বই

বিজ্ঞান যখন ভাবায় ২৬৫

লুচি কেন ফোলে? রক্তের রঙ লাল কেন? লাল মরিচ লাল কেন? তেঁতুল কেন বেশী টক? নারকেলের তিনটি মাত্র চোখ কেন? উল্কার কি নিজস্ব আলো আছে? গাছের পাতা ঝরে পড়ে কেন? ছাতার রং কালো কিন্তু ট্রাফিক পুলিশের ছাতার রঙ সাদা কেন?

এই ধরণের অনেক প্রশ্ন আর কৌতূহলের খোরাক আছে এই বই-এর পাতায় পাতায়। অনেক ছবিতে সমৃদ্ধ বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি এক ঐতিহাসিক প্রকাশন।

● ● ●

অরূপরতন ভট্টাচার্য ও **শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়** সম্পাদিত

স্বাস্থ্য যখন ভাবায় ১০০

খেতে বসে কথা বলা কি খারাপ? হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি ওষুধ কি এক সঙ্গে খাওয়া চলবে? কানে পোকা ঢুকলে কি করবো? বাড়িতে মানিপ্ল্যান্ট থাকলে কি ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়ে? কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া কি দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর? নিম দাঁতন না টুথব্রাশ কোনটা বেশী উপকারী? চোখে গগলস সারাক্ষণ ব্যবহার করা কি চোখের পক্ষে ক্ষতিকর? দেশী ডিম বা পোলট্রি ডিম কোনটা বেশী উপকারী? একটি নবজাত শিশু বধির কিনা তা কি করে জানা যায়? চুলে মেহেন্দি লাগানো কি উচিৎ।

চিকিৎসা শাস্ত্রের কৌতূহলকর এই ধরণের হাজারো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এই বইটিতে যাতে কেটে যাবে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস, সংশয় ও অবৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা।

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা.) লিমিটেড

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩

ইদানীং বুলবুল হঠাৎ এমন সব উল্টোপাল্টা কথা বলে ফেলছে, যা সে আদৌ বলতে চায় না। তারও খুব কান্না পায়। দু'ঘরে মেজো ও সেজো বউ কাঁদতে থাকে। রুনা দৌড়ে গিয়ে বড়জেঠিমাকে ডেকে আনে।

বড়জাকে ওরা দুই জা খুব মানে। শাশুড়ির মতোই তিনি এ সংসার আগলে রেখেছেন। বড় বউ রুনার কাছে ঝড়বৃষ্টির কারণ জেনে আগে সেজোর ঘরে ঢোকেন। সেজোকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলেন, পাগলী মেয়ে, কাঁদছিস কেন? সান্ত্বনা পেয়ে বুলবুলের কান্নার ঢেউয়ের উচ্চতা আরও বাড়ে। কোনোরকমে চোখের জল সামলেসুমলে বলে, আমি খুব খারাপ মেয়ে। আমার এতটুকুও ধৈর্য নেই! আমি কী করবো তুমি বলে দাও!

বড়জা এবার 'মা' হয়ে বলেন, তোকে কিচ্ছু করতে হবে না। তোর রেগে যাওয়ার কারণ আমি জানি। গানটান সব ছেড়ে দিয়েছিস বলেই এমন হচ্ছে। কাল থেকে আবার তুই গানের ক্লাসে যাবি। টাকার জন্য ভাবিস না। টাকা আমি দেব। কত ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতিস তুই! সেই গানই আবার তোকে পরিশুদ্ধ করে তুলবে। সহনশীলতা শেখাবে।

বুলবুল আনন্দ আর কান্নায় ভেসে যেতে থাকে। এরপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। বড়দির হাত ধরে বলে, চলো, মেজদির ঘরে যাই; আমাকে যে ওর কাছে ক্ষমা চাইতেই হবে।

ছবি : সুফি

এ ছাড়াও যাঁদের লেখা ভালো হয়েছে :

লক্ষ্মীশ্রী লাই (লেকটাউন, কলকাতা)।। পাবন কুশারী (যুগীপাড়া, চন্দননগর)।। প্রদ্যোৎ পালুই (বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া)।। উপাসনা পুরকায়স্থ (উল্টোডাঙা, কলকাতা)।। সৌরভী বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা)।। মিন্টু রায় (উলুবেড়িয়া, হাওড়া)।। চৈতালী দত্ত (দুর্গাপুর, বর্ধমান)।। অভিজিৎ দাস (বিধান শিশু সরণী, কলকাতা) ।। কৃষ্ণদাস সামন্ত (পাথরবেড়িয়া, দঃ ২৪ পরগনা)।।

বিশেষ পুরস্কার

এখন তোমরা আরো পুরস্কার পাচ্ছ। আমাদের লেখক ও বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি. চন্দ্র তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবাশিসের নামে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দেবেন।

এ মাসের পুরস্কার প্রাপকরা : সৌরভ কুমার ভূঞ্যা, শিপ্রা ভৌমিক, লক্ষ্মীশ্রী লাই, পাবন কুশারী ও প্রদ্যোৎ পালুই।

ঘোষণা

নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরি থেকে সমীর সরকার ও ডালিয়া সরকার তাঁদের প্রয়াত পিতা সুশীল কুমার সরকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁদের প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে সুশীল কুমার সরকার স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য মৌলিক লেখা চাইছি।

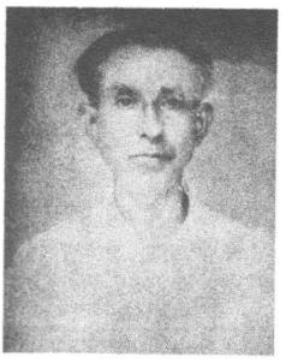

সুশীল কুমার সরকার

বিষয়বস্তু

সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ

পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হবে।

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৭ ফাল্গুন।

প্রথম পুরস্কার : ১০০ টাকা ❑ দ্বিতীয় পুরস্কার : ৫০ টাকা

দেশের মাঠে হিরো, বিদেশে জিরো

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বছর অর্থাৎ ২০০১ সালে ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্য ও ব্যর্থতার দিকে যদি তাকাই তাহলে একটা জিনিসই বিশেষ ভাবে আমাদের চোখে পড়বে তা হলো সৌরভ বাহিনীর ধারাবাহিকতার অভাব। কখনো ভারতীয় দল দেখেছে সাফল্যের হাতছানি, পরমুহূর্তে ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলে উঠেছেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা, সেই সঙ্গে জ্বালিয়েছেন গোটা দেশকে। অথচ বছরের শুরুটা হয়েছিল দুর্দান্তভাবে। ক্রিকেটের অঘোষিত চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া এসেছিল ভারত সফরে। ভারতে আসার আগে থেকেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলপতির —অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ ওয়া আর ভারতের সৌরভ গাঙ্গুলির মধ্যে শুরু হয়েছিল বাকযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে একথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে বিনা লড়াই-এ কোনো দেশই কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছেড়ে দেবে না। মাঠের বাইরে যা হয়েছিল মাঠের মধ্যেও সেই একই দৃশ্য দেখা গেল।

প্রথম টেস্টে ভারত গোহারা হেরে গেলেও সৌরভ গাঙ্গুলি দলবল নিয়ে যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তা সত্যিই মনে রাখার মতো। শেষ পর্যন্ত ২-১ টেস্টে রাবার জিতে গোটা বিশ্বকে ভারত বুঝিয়ে দিয়েছিল, হাম কিসিসে কম নেহি। কিন্তু তা যে শুধু দেশের মাটিতে তা অচিরেই বোঝা গেল। জিম্বাবুয়ে গিয়ে ভারত প্রথম টেস্টে অনায়াসে জিতল। কিন্তু তার পরের টেস্ট ম্যাচটি অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গিয়ে মরশুম শেষ করল ১-১ টেস্টে। এরপর শুরু হলো পরাজয়ের পালা। প্রথমে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট লড়াই-এ ভারত হেরে গেল ২-১ এ। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে ১-০ টেস্টে রাবার হারল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। তবে বছরটা শেষ হলো ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ১-০ টেস্টে জিতে।

গত বছরের এই ফলাফল প্রমাণ করে দেয় যে আমরা আগের মতো এখনো দেশের মাঠে হিরো, বিদেশে জিরো। গত বছর যে দুটি দেশের বিরুদ্ধে ভারত রাবার জিতেছে সেই দুটি দেশই—অস্ট্রেলিয়া আর ইংলন্ড ভারতে খেলতে এসেছিল। ইংলন্ডের সঙ্গে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ এইবার শুরু হবে। ছটি ম্যাচ খেলবে ভারত আর ইংলন্ড। সেই ম্যাচগুলিই হবে ২০০২ সালে ভারতের প্রথম খেলা। সে লড়াই-এ কে জিতবে— ভারত না ইংলন্ড ? তবে খেলা যখন ভারতের মাটিতে তখন যে ভারতই জিতবে তা এখনই হলপ করে বলা যেতে পারে।

এ তো গেল টেস্ট ম্যাচের কথা। একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের ক্ষেত্রে সৌরভ বাহিনী গোটা ভারতকে হতাশ করেছেন। টানা আটবার দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেও হেরে গেছেন। এই আটবারের মধ্যে তিনবারই আবার হয়েছে গত বছর অর্থাৎ ২০০১ সালে। ব্যাপারটা নিয়ে সত্যিই কিন্তু ভাবনা-চিন্তা করার সময়

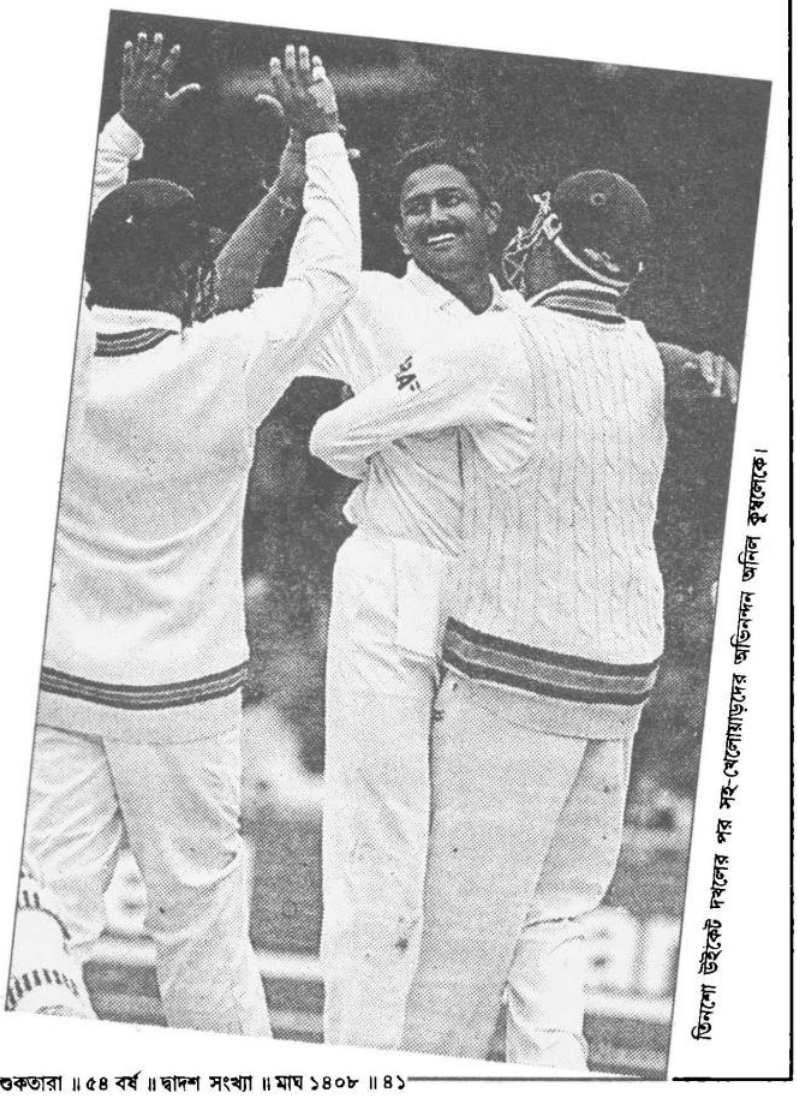

তিনশো উইকেট দখলের পর সহ-খেলোয়াড়দের অভিনন্দন অনিল কুম্বলেকে।

ম্যান অফ দ্য সিরিজ ট্রফি হাতে শচীন তেন্ডুলকর।

করেছেন, শ্রীনাথের সংগ্রহ ২০০-র ওপর উইকেট। ভারতীয় দলের নতুন আবিষ্কার হরভজন সিং ইতিমধ্যেই বিশ্বের তাবড় সব ব্যাটসম্যানের কাছে বিভীষিকার মতো হয়ে গেছেন। হরভজন সিং টেস্ট ক্রিকেটে ৬০টি এবং একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ২৬টি উইকেট দখল করেছেন। এ ছাড়া বাংলার উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান দীপ দাশগুপ্ত ইংলন্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেও কিন্তু দলে স্থান পাবার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত নন। কারণ উইকেটরক্ষকতায় দীপের পারফরমেন্স কিন্তু মোটেই আশানুরূপ নয়। দীপকে তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনুশীলন করে করে দক্ষ ও পরিণত হতে হবে।

গত বছরটা ভারতীয় দলনেতা সৌরভ গাঙ্গুলির অত্যন্ত খারাপ সময় গেছে। তাঁর ব্যাটে রান নেই। একটা গোটা বছর একই রকম ভাবে কেটে গেল। একদিনের ক্রিকেটে তবু দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তিনি রানের মুখ দেখেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে কিন্তু তিনি তা পারেননি। গত প্রায় ২৫টি টেস্ট ইনিংসের মধ্যে মাত্র একবারই সৌরভ পঞ্চাশের ওপর রান করেছেন। ফলে সৌরভের ফর্ম নিয়ে যে

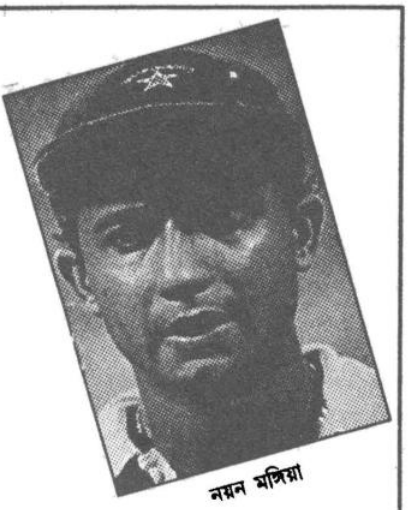

নয়ন মঙ্গিয়া

বিতর্ক চলছে তা মোটেই অমূলক নয়। দলনেতা যদি দীর্ঘদিন ফর্মে না থাকেন তাহলে তার প্রভাব তাঁর দল পরিচালনার ওপর এসে পড়বেই।

সৌরভ গাঙ্গুলি অত্যন্ত দক্ষ ও পরিণত ব্যাটসম্যান। লাফিয়ে ওঠা বলে খেলতে যে তাঁর অসুবিধে হয় তা সকলেই জানেন। তাই

ইংলন্ডের অধিনায়ক নাসির হুসেন।

এসেছে। কেন এমন হবে? ফাইনালে উঠেও ভারত কেন সাত তাড়াতাড়ি এবং বারবার হেরে যাচ্ছে? ভারতের চেয়ে অনেক কম শক্তিধর দেশও টেক্কা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের।

ব্যক্তিগত ক্রীড়া-কীর্তির দিক থেকে গত বছরটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। শচীনের হাতের ব্যাট যে এবার রানের পেছনে কীভাবে ছুটেছে তার প্রমাণ মিলবে ওঁর প্রতিভায়। শচীন তেন্ডুলকর ২০০১ সালে টেস্ট ক্রিকেটে হাজারের ওপর অর্থাৎ ১০০৩ রান করেছেন। ইনিংস প্রতি যার গড় রান ৬২.৬৮। আর একদিনের ক্রিকেটে তিনি করেছেন ৯০৩ রান। অর্থাৎ ইনিংস প্রতি ৬৯.৫৩। এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। এ ছাড়া অনিল কুম্বলে ৩০০ উইকেট দখল

সৌরভকে এখনই সেই দুর্বলতা শুধরে নিতে হবে। সেই চেষ্টা তিনি অবশ্য করছেন। মহিন্দর অমরনাথের কাছ থেকে তিনি ইতিমধ্যেই টিপস নিয়েছেন। জিওফ বয়কটও সৌরভকে পরামর্শ দিতে এক পায় খাড়া। তিনি বলেছেন, ও আমায় শুধু একবার ফোন করুক তাহলেই হবে। সৌরভ ভালো খেলোয়াড় বলেই এঁরা তাঁকে পরামর্শ দিতে চাইছেন। সাহায্য করতেও রাজী।

তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলার পর ইংলন্ড দল বড়দিন ও নববর্ষ পালন করার জন্যে দেশে ফিরে গিয়েছেন। দেশ থেকে ফিরে এসে তাঁরা একদিনের লড়াই-এ নামবেন। দু'দেশের মধ্যে ছটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ হবে। এই খেলাগুলি ভারতীয় দলপতি সৌরভ গাঙ্গুলির কাছে একরকম পরীক্ষা। সৌরভ যদি রান পান তাহলে তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক রয়ে যাবেন। না হলেই মুশকিল। সৌরভ হারাতে পারেন দলনেতার পদ। সেক্ষেত্রে দলে তাঁর স্থান পাওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। আমরা আশা করব, এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৌরভ কিছুতেই তৈরি হতে দেবেন না।

বাঙ্গালোরে আউট হওয়ার মুহূর্তে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

অ্যাথলেটিকস থেকে ক্রিকেটে

বাবার নাম টি সি জোহানন। ভারতের এক সময়কার নামকরা অ্যাথলিট। ১৯৭৪ সালে এশিয় ক্রীড়ায় ভারতকে লংজাম্পে সোনা এনে দিয়েছিলেন। কেরল ভারতকে অনেক অ্যাথলিট উপহার দিয়েছে। তাই এশিয়াডের সোনাজয়ী অ্যাথলিট জোহাননের ছেলেও যে অ্যাথলেটিকসের দিকে ঝুঁকবে তাতে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই টি সি জোহাননের ছেলে টিনু বাবার দেখাদেখি লাফ-ঝাঁপের দিকেই নজর দিয়েছিল। তবে বাবার মতো লংজাম্প নয়, টিনুর পছন্দ ছিল হাইজাম্প।

একটু বড় হতেই টিনু বুঝে গেল, লংজাম্প বা হাইজাম্প নয়—অ্যাথলেটিকসও নয়, দেশের সব থেকে জনপ্রিয় খেলা আজ ক্রিকেট। ফুটবলও পাত্তা পাচ্ছে না ক্রিকেটের কাছে। টিনু ঠিক করল, সে ক্রিকেট খেলবে। ছিপছিপে চেহারা হলে কী হবে সে বেশ লম্বা। ছুটে এসে বল করতে তার ভালোই লাগে। তার বলেও নাকি বেশ জোর। বন্ধুরা

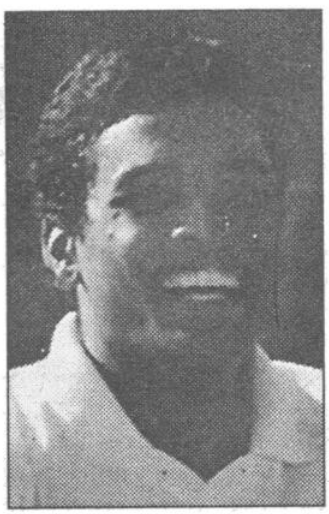

ভালো খেলতে পারে না। চটপট আউট হয়ে যায়। টিনুর মনে হলো অ্যাথলেটিকস ছেড়ে সে যে পুরোপুরি ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকছে কথাটা বাবাকে জানিয়ে রাখা ভালো।

একদিন সে সোজা বাবার কাছে গিয়ে বলল, বাবা আমি তোমার মতো অ্যাথলিট হতে চাই না।

সে কী? কেন?

আমি ক্রিকেটার হতে চাই!

ক্রিকেটার! তা কী হবে, ব্যাটসম্যান না বোলার?

বোলার। আমি জোরে বল করতে চাই।

ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। তবে যাই করো বাবা, মন দিয়ে খেলো। মনে রেখো খেলাটাও কিন্তু সাধনা।

সেই শুরু হলো টিনুর ক্রিকেটার হবার প্রচেষ্টা। ক্রিকেট খেলায় কেরল অন্য সব রাজ্য থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে। তাই তাকে গাইড করার মতো তেমন কাউকে পায়নি সে। তবে তা গোড়ার দিকে। তারপর প্রচণ্ড পরিশ্রম আর উৎসাহ টিনুকে একদিন সত্যিই পেস বোলার হিসেবে স্বীকৃতি এনে দিলো। তার হাতে ভালো ইনসুইং আছে।

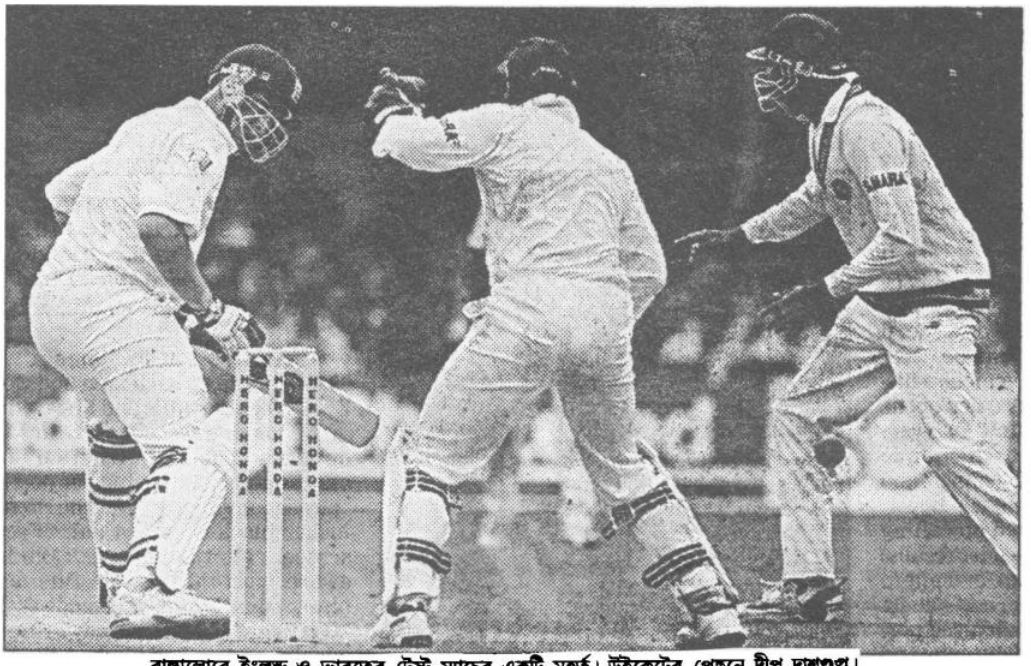

বাঙ্গালোরে ইংলন্ড ও ভারতের টেস্ট ম্যাচের একটি মুহূর্ত। উইকেটের পেছনে দীপ দাশগুপ্ত।

এইটাই তার প্রধান অস্ত্র।

শ্রীনাথের যোগ্য সঙ্গীর সন্ধান করতে গিয়ে নির্বাচকদের নজর পড়ল ছেলেটির ওপর। ওর বোলিং-এর পারফরমেন্স রীতিমতো ভালো। বলের গতি ভালো। তার সঙ্গে আছে ইনসুইং। বেশ লম্বা, ছিপছিপে গড়ন। ছেলেটাকে দেখলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেই মনে হয়। সুতরাং ভারতীয় দলে এসে যেতে টিনু জোহাননের খুব একটা সময় লাগল না। মোহালি টেস্টে টিনু ভারতের পক্ষে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেল। কেরল থেকে টিনুই প্রথম টেস্টে খেলার রেকর্ড গড়ে মোহালিতে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে খেলল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, টিনুর মধ্যেই ভারত খুঁজে পাবে শ্রীনাথের যোগ্য সহযোগীকে।

উক্তি

আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। আগে কাঁধের ব্যথাটা সারাবো তারপর আবার মাঠে নামবো।

রাহুল দ্রাবিড়

(দক্ষিণ আফ্রিকায় কাঁধের চিকিৎসা করাতে যাবার সিদ্ধান্ত নেবার পর)

এই দিনটির দিকে আমি দীর্ঘদিন তাকিয়ে আছি। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে।

অনিল কুম্বলে

(টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেট দখলের পর)

এই ধাক্কাটার দরকার ছিল। এবার যদি আমাদের দল ভালো খেলতে পারে তাহলে খুশি হব।

সুব্রত ভট্টাচার্য

(জাতীয় লীগে হ্যালের কাছে ৩-১ গোলে মোহনবাগান অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যাবার পর)

আমায় জিজ্ঞেস করলেই টিপস দেবো। জিজ্ঞেস না করলে কী আর গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া যায়! শুনেছি জিমির (মহিন্দর অমরনাথ) কাছ থেকে টিপস নিচ্ছে। সৌরভ যদি আমার উপদেশ শুনে চলত তাহলে এমন অবস্থা ওর হতো না।

সুনীল গাভাসকার

(সৌরভ গাঙ্গুলির পারফরমেন্সের ওপর বলতে গিয়ে)

আমার প্রিন্স অফ ক্যালকাটা সৌরভ গাঙ্গুলি ভালো ব্যাটসম্যান। ওর একটু অসুবিধে হচ্ছে। সে দুর্বলতা ও কাটিয়ে উঠবে। আমিও ওকে সাহায্য করতে রাজী আছি। আমায় একটা ফোন করলেই আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

জিওফ বয়কট

(ইংলন্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের পর একটি লেখায়)

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্ন ঃ (প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। তিনটি ভুল। একটি ঠিক। উত্তর ৪৬ পাতায়।)

১। 'নক আউট' কথাটা কোন খেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে?

দাবা | মুষ্টিযুদ্ধ | বিলিয়ার্ডস | বাস্কেটবল

২। আইস হকি খেলায় একটি দলে কতজন খেলোয়াড় থাকে?

পাঁচজন | ছয়জন | সাতজন | আটজন

৩। মেয়েদের টেনিসে সব থেকে বেশিবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতেছেন কে?

স্টেফি গ্রাফ | মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা | ক্রিস ইভার্ট | মার্টিনা হিঙ্গিস

৪। একমাত্র দেশ কোনটি যারা বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা হিসাবে জিতেছে?

অস্ট্রেলিয়া | ইংলন্ড | শ্রীলঙ্কা | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

৫। একটি ক্রিকেট পিচের ওপর মোট কটি কাঠের ক'টুকরো বিভিন্ন আকারে দেখা যায়?

১৬ | ১৪ | ১০ | ১২

৬। ভারতে দাবার প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার কে হন?

বিশ্বনাথন আনন্দ | দিব্যেন্দু বড়ুয়া | অভিজিৎ কুন্তে | কৃষ্ণান শশিকরণ

৭। কোন ভারতীয় ক্রিকেটার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হন?

মনসুর আলি খান পাতৌদি | আব্বাস আলি বেগ | সুনীল গাভাস্কার | দলিপ সিংজী

৮। সাঁতারে সব থেকে মন্থর স্ট্রোক কোনটি?

ফ্রি স্টাইল | ব্যাক স্ট্রোক | বাটারফ্লাই | ব্রেস্ট স্ট্রোক

৯। ক্রিকেট পিচ লম্বায় কত বড়?

২০ গজ | ২৬ গজ | ২২ গজ | ২৮ গজ

১০। ক্রিকেট কোথায় প্রথম খেলা হয়?

ইংলন্ড | অস্ট্রেলিয়া | দক্ষিণ আফ্রিকা | নিউজিল্যান্ড

ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে বিশেষ ছাড়ে
তৎসহ বিনা খরচে রেজিস্ট্রি মারফত প্রেরণ

মনস্বী জগদীশ ঘোষের

আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ - ১০০
ব্যবহারিক শব্দকোষ - ২০০
(বাংলো - বাংলো অভিধান)

মজবুত বোর্ড বাঁধাই

মানিঅর্ডারে মাত্র ২০০ টাকা পাঠালে এই বই দুইটি রেজিস্ট্রি মারফত পাঠানো হবে।

এছাড়াও উচ্চ কমিশনে অন্যান্য বই

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩ ফোন - ২৪১ - ৬১৩৮

স্থাপিত ১৯১৪

জুনিয়ার বিশ্বকাপে জাপানের বিরুদ্ধে গোল করার চেষ্টা করছেন দীপক ঠাকুর।

গত বছরটা

গত বছর অর্থাৎ ২০০১ সাল ভারতীয় খেলাধূলার জগতের পক্ষে ভালো-মন্দয় কেটেছে। ক্রিকেটের কথা আগেই বলা হয়েছে, ফুটবল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে হকিতে ভারতের জুনিয়ার দলের সাফল্য ভারতকে আশার আলো দেখিয়েছে। বড়রা যা পারেনি বা পারছে না ছোটরা তাই করে দেখিয়েছে। ভারতের জুনিয়ার হকি দল এখন বিশ্বসেরা। বিশ্বকাপ তাদের দখলে। ফাইনালে তারা আর্জেনটিনাকে ৬-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। দলের সহ অধিনায়ক দীপক ঠাকুর ফাইনালে হ্যাটট্রিক সহ মোট ১০টি গোল দিয়েছেন ঐ প্রতিযোগিতায়।

দলগত প্রতিযোগিতা থেকে এবার যদি ব্যক্তিগত কৃতিত্ব প্রদর্শনের প্রসঙ্গে আসি তাহলে দেখতে পাবো, সেখানেও একই দৃশ্য—সাফল্য আর ব্যর্থতা। টেনিসে লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতি তেমন কিছু করতে পারেননি। তবে ব্যাডমিন্টনে গোপীচাঁদ ভারতকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অল ইংলন্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে। ১৯৮১ সালে প্রকাশ পাড়ুকোন এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এবার যুক্ত হলো গোপীচাঁদের নাম।

এর পরই আসবে বিশ্বনাথন আনন্দের নাম। গতবছর তিনি হয়েছেন দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। তবে গত ডিসেম্বর মাসে তিনি ইউক্রেনের ভ্যাসিলি ইভানচুকের কাছে খেতাব হারান। আনন্দ কিন্তু লড়ছেন। এবার হেরেছেন আবার জিতবেন। ভারতীয় দাবাকে আনন্দ অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছেন, ভবিষ্যতেও দেবেন বলে মনে হয়। মেয়েদের মধ্যে কোনর হাম্পি আন্তর্জাতিক দাবায় মেয়েদের জুনিয়ার বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অটুট রেখে চলেছে। ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার হতে তার হয়তো আর খুব বেশিদিন লাগবে না। হাম্পির বয়েস ১৫। সে এখন ১৬ বছরের কম বয়স্কদের বিভাগে বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়।

ফিফার দেওয়া বর্ষসেরা ট্রফি হাতে লুই ফিগো।

স্পোর্টস কুইজের উত্তর ঃ

১। মুষ্টিযুদ্ধ
২। ছয়জন
৩। স্টেফি গ্রাফ
৪। শ্রীলঙ্কা
৫। ১২টি
৬। বিশ্বনাথন আনন্দ
৭। মনসুর আলি খান পাতৌদি
৮। ব্রেস্ট স্ট্রোক
৯। ২২ গজ
১০। ইংলন্ড

উঠছে যারা

বীরু বসু

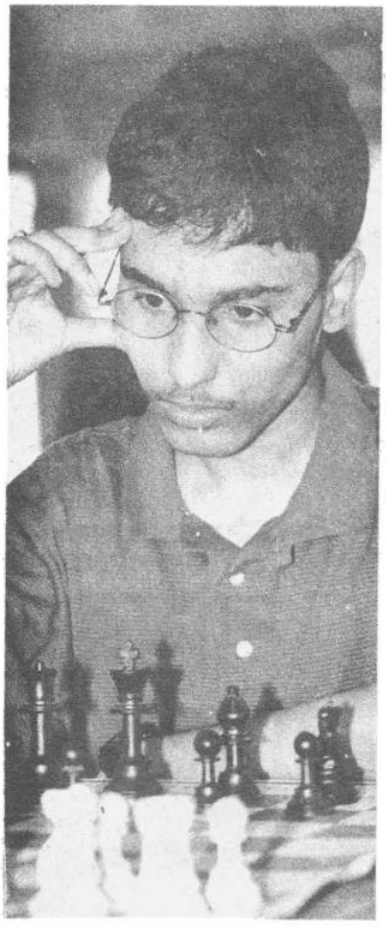

সোমক পালিত

লেখাপড়া আর খেলাধূলা এই নিয়েই বড় হচ্ছে ভবানীপুরের ছেলে সোমক পালিত। পনেরো বছরের ছেলে সোমক মিত্র ইনস্টিটিউট-এর দশম শ্রেণীর ছাত্র। আগামী বছর সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ছাত্র হিসেবে বরাবরই ভালো। বাৎসরিক পরীক্ষায় ওর শতকরা সত্তর নম্বর বাঁধা। সে কারণেই মাধ্যমিকের ফলাফল নিয়ে সোমক যথেষ্ট আশাবাদী। খুব ছোট বয়স থেকে খেলাধূলার প্রতি সামান্য ঝোঁক ছিল। লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ায় বাড়ির বাইরে খুব একটা যেত না। ফলে অন্যরা যখন ফুটবল বা ক্রিকেট খেলতো, সোমক তখন ঘরে বসে ঠাকুমার সঙ্গে দাবা খেলতো। দাবা খেলার ব্যাপারে ঠাকুমা শান্তা পালিতের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। সেই অভিজ্ঞতাই মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি দিয়ে গেছেন সোমককে। দাবার প্রাথমিক শুরুটা এভাবেই।

ন'বছর বয়সে মা মমতা পালিত একমাত্র ছেলে সোমককে ভর্তি করে দেন আলেখিন চেস ক্লাবে। বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে সোমক যখন বাইরের জগতের সঙ্গে মিশতে শুরু করে তখন থেকেই ওর বুদ্ধি আর সাহস বাড়ে। ওর মধ্যে জেগে ওঠে বড় হওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছা। ২১সি, স্কুল রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-২৫ থেকে নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকে গোর্কিসদনে। ফলে খেলারও উত্তরোত্তর উন্নতি হয়। এই সময় সোমকের পাশে ছিলেন দাবার প্রশিক্ষক নীলাদ্রিপতি বিশ্বাস এবং আলেখিন চেস ক্লাবের অন্য কোচেরা। কিন্তু নীলাদ্রিপতি বিশ্বাস বিভিন্ন চালের মারপ্যাঁচে কীভাবে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে হারাতে হয় সে সমস্ত কৌশল সোমককে শিখিয়ে দেন।

বর্তমানে সোমক বিপিন সিনহার কাছে দাবার তালিম নিচ্ছে। এর আগে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেলেও বিপিনবাবুর তত্ত্বাবধানে সোমক টেলিগ্রাফ স্কুল দাবায় চ্যাম্পিয়ন হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। একঝাঁক প্রতিযোগী থাকা সত্ত্বেও সোমক প্রমাণ করতে পেরেছে বাংলার স্কুল দাবায় সে এখন সেরা। এই কৃতিত্ব অর্জন করতে সোমকের সময় লেগেছে মাত্র ছ'টি বছর। দাবা খেলার প্রতি ওর একনিষ্ঠ মনোভাব, ধৈর্য, সাধনা এনে দিয়েছে বিরাট সাফল্য। গত বছর স্কুল দাবায় এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল দমদমের ছেলে সপ্তর্ষি রায়। এবারের এই প্রতিযোগিতায় কিন্তু সপ্তর্ষিকে হারতে হয়েছে সোমকের কাছে। প্রতিযোগিতায় দু'জনের পয়েন্ট (৯.৫) সমান হলেও প্রগ্রেসিভ পয়েন্টে এগিয়ে থাকায় উদ্যোক্তারা সোমককেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দের হাত থেকে পুরস্কার নিতে পেরে সোমক স্বাভাবিক ভাবেই গর্বিত। পুরস্কার পাওয়ার পরে সোমক জানিয়েছে এর পুরো কৃতিত্ব ওর ঠাকুমার। তিনি আজ বেঁচে থাকলে পুরস্কারটা সোমক তাঁর হাতেই তুলে দিত। তবুও সোমক খুশি বাড়ির সকলের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছে বলে।

ঠাকুমা ছাড়া আরো একজনের কথা সোমক বারবার উচ্চারণ করেছে। তিনি হলেন ওর কাম্মা, যাঁর ভালোবাসা, প্রেরণা, আন্তরিকতা সোমককে দাবায় উঠে আসতে সাহায্য করেছে। বাবা-মা উভয়েই সি.এম.সি.-তে চাকরি করেন। বাবা বেশি সময় দিতে না পারলেও মা কিন্তু ছেলের খেলার ব্যাপারে যথেষ্ট সিরিয়াস। মা-র কঠোর শাসনের ফলেই লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধূলায় সোমক এখন সাফল্য পাচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত আন্তর্জাতিক রেটিং দাবায় সোমক তৃতীয় স্থান পায়। ওর রেটিং এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৬০। লক্ষ্য সাবজুনিয়র (জাতীয়) চ্যাম্পিয়নশিপ। এর পরে বিশ্বদাবায় অংশগ্রহণ করারও ইচ্ছে আছে।

লেখাপড়া ও খেলাধূলা ছাড়া সোমকের বড় নেশা গল্পের বই পড়া আর টি.ভি. দেখা। সময় পেলেই সত্যজিৎ রায়-এর বই নিয়ে বসে পড়ে। ক্রিকেট-প্রিয় সোমক শচীন তেন্ডুলকরের বড় ভক্ত। এছাড়া নবাগত উইকেটকিপার দীপ দাশগুপ্তর অন্তর্ভুক্তিকে সে সমর্থন করেছে। তবে এই মুহূর্তে সে খেলাধূলা, গল্পের বই এবং টিভি দেখা থেকে কিছুটা সরে থাকতে চাইছে। কারণ মাধ্যমিক পরীক্ষা এসে গেছে। অন্যদিকে মন দিলে ফলাফল খারাপ হতে পারে। সে কারণেই দাবার মোক্ষম চালটা এখন লেখাপড়ার মধ্যেই সে দিতে চাইছে। যার উত্তর মাধ্যমিকের ফলাফলের পরেই জানতে পারবে।

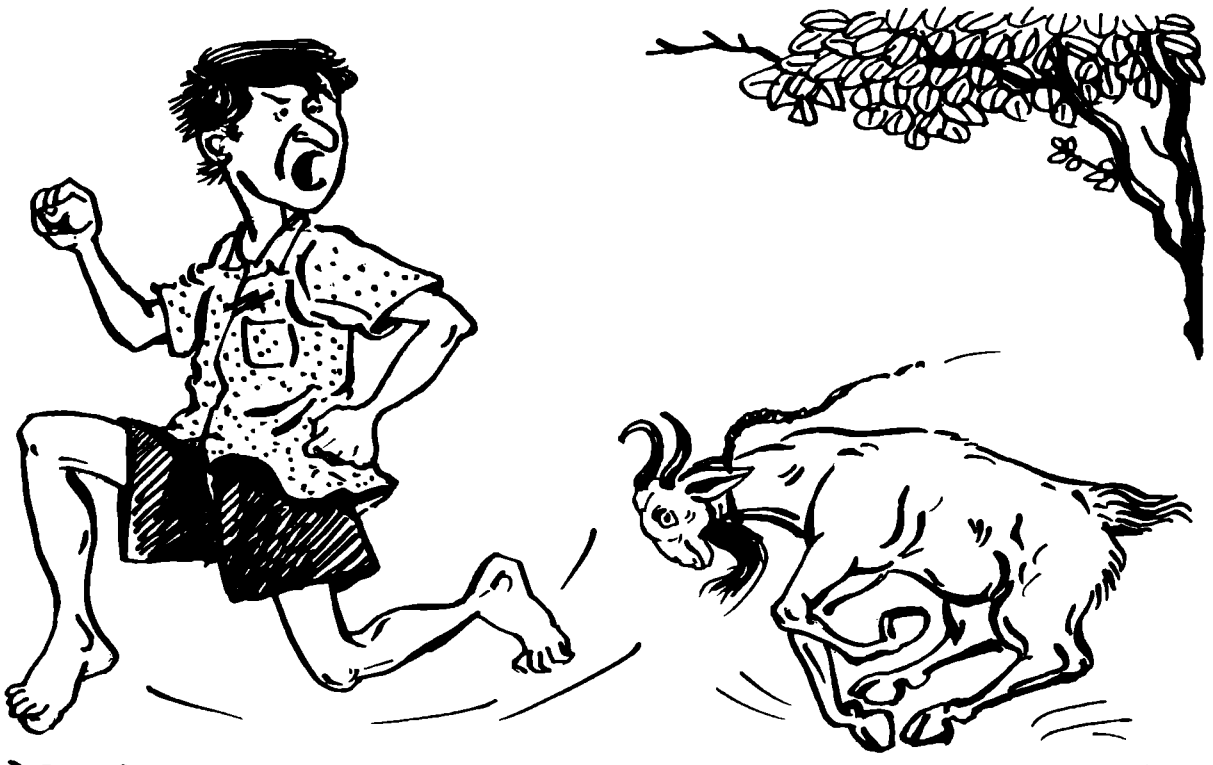

রামুর রামছাগল

দীপক কর

রামু আমার বন্ধু। তবু ওকে আমি ভীষণ ভয় করে চলি। আমার মতো কানাই, বিল্টু, বুলা, অশোকরাও ওকে ভয় করে চলে। আর না করে উপায়-ই বা কি আছে! যেমন চেহারা তেমনি গায়ে জোর। রামু যখন হাত দুটো টান টান করে মোচড়ায় এবং বুক ফুলিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, আমরা তখন কাঁচুমাচু মুখ করে নিজেদের হাত কচলাই।

কার গাছে পেঁপে পেকেছে, কোন গাছে আম, পেয়ারা, কাঁঠাল— সব কিছু চোখের নিমেষে উধাও করে দিতে পারে রামু! এ হেন ছেলে থেকে পাড়ার সবাই সাবধান থাকে।

স্কুলেও একই অবস্থা। ওর উৎপাতে ছাত্র-ছাত্রী এমনকি শিক্ষকমশাইরা পর্যন্ত অস্থির। রোজই বলতে গেলে বকুনি আর না হয় প্রধান শিক্ষকের হাতে কয়েক ঘা খেতে হয় রামুকে। তবু ওর লজ্জা নেই।

রামুর একটা রামছাগল আছে। ছাগলটা ওর খুব প্রিয়। পাড়াতে ও যতক্ষণ থাকবে, সঙ্গে রামছাগল থাকবেই। ইয়া বড় ছাগল। বড় বড় শিং। লম্বা দাড়ি। দেখলেই ভয় করে। রামু ইশারা করলেই শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসে।

এই তো সেদিন আমরা খেলছি। রামুকে খেলতে নেওয়া হয়নি। ও রেগে বোম! কিছু দূরে রামছাগল ঘাস খাচ্ছিল। রামু ডাকতেই এক দৌড়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর আমাদের দিকে ইশারা করতেই, রামছাগলটা শিং উঁচিয়ে তেড়ে এলো। আমাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। শেষে খেলা পণ্ড। রামু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখল আর খিল খিল করে সে কী ওর হাসি। ভেতরে ভেতরে আমাদের ভীষণ রাগ হচ্ছিল, কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলতে পারলাম না, কারণ ওর সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়।

আমি, বিল্টু, অশোক, কানাই মাঠে বসে আলোচনা করছি কি করে রামুকে জব্দ করা যায়। ঘন্টা বাঁধার কথা উঠলেই সবাই চুপ। এমন সময় রামু হাসতে হাসতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সেই রামছাগল। বড় বড় চোখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে। কানাই একটু সরে আমার কাছ ঘেঁষে বসল।

রামু বলল, কি রে ছাগল দেখে তোরা ভয় পেলি? বিল্টু সাহস করে বলল, না, না, তোর ছাগলকে আবার ভয় পাওয়ার কি আছে!

যেমনি বলা অমনি রামুর ইশারায় বিল্টুর দিকে তেড়ে এলো রামছাগল। বিল্টু পড়িমরি করে দৌড় লাগাল, পেছন পেছন রামছাগল। আমি রামুকে বার বার বলতে লাগলাম ছাগলটাকে ডাকতে। শেষে রামু ডাকতেই রামছাগল ফিরে এলো।

বিল্টু তখনও দৌড়াচ্ছে। সে কী দৌড়। আমরা ডাকছি চিৎকার করে। বিল্টু শুনতে পেল না। আচমকা হোঁচট খেয়ে সটান শুয়ে পড়ল মাটিতে। আমরা দৌড়ে গেলাম। বেচারাকে মাটি থেকে টেনে তুলে বসানো

হলো। বড় বড় করে শ্বাস ফেলছে তখন বিল্টু। আর ওর এই অবস্থা দেখে রামু হো হো করে হাসছে।

পরদিন স্কুল থেকে ফিরে আমরা খেলছি। হঠাৎ কালী আমাদের ডেকে রামুদের পেয়ারা গাছটা দেখাল। আমরা অবাক! বড় বড় পেয়ারা হয়ে আছে গাছে। সবার জিভে জল গড়িয়ে পড়ল । আঃ, পেয়ারাগুলো যদি নিজে থেকেই টুপ টুপ করে পড়তো!

রামু বড্ড চালাক। কেউ যাতে গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে নিতে না পারে, তাই গাছের গোড়াতে রামছাগলকে বেঁধে রেখেছে। ফলে পেয়ারা খাওয়ার পরিকল্পনায় ওখানেই ইতি টানতে হলো। শুধু দেখা ছাড়া আর করার কিছু নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রামু। হাসতে হাসতে বলল—কি রে, পেয়ারা খাবি? খুশিতে আমাদের মন দুলে উঠল। মুখে কান-এঁটো-করা হাসি ফুটিয়ে সবাই বললাম, হ্যাঁ—হ্যাঁ, খাব।

ফিক করে হেসে ফেলল রামু। আমাদের কলা দেখিয়ে নিজেই গাছের দিকে এগিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম ও আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে একা পেয়ারা খাবে।

রামু গাছে উঠে একটা পেয়ারা পেড়ে খেতে শুরু করল। মাঝে-মধ্যে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আরও দু'খানা পেয়ারা পকেটে ভরে গাছ থেকে নেমে আসামাত্র, আমাদের সবাইকে অবাক করে ওর পায়ে সজোরে এক গুঁতো মারল রামছাগল। আমরা থ!

রামু 'ও মাগো' বলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। আমরা কেউ বিশ্বাসই করতে পারছি না যে, ওর ছাগলই ওকে গুঁতো মেরেছে। বুলা কানাই হো হো করে হেসে উঠল।

রামু উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে আমাদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ঘরে চলে গেল। এতদিনে ওর উচিত শিক্ষা হয়েছে। আমরা ভীষণ খুশি। মনে মনে রামছাগলটাকে ধন্যবাদ দিলাম।

পরদিন স্কুলে গেলাম। সারা স্কুল থেকে শিক্ষকমশাইরা পর্যন্ত ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন যে, রামুকে রামছাগল গুঁতো মেরেছে। কথাটা অবশ্য কালীই প্রচার করেছে। রামু ক্লাসে ঢুকতেই আমাদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন উঠল। কেউ কেউ নিচু স্বরে হাসল।

আশ্চর্য ব্যাপার রামু কেমন নিশ্চুপ! কোথায় ওর সেই দুরন্তপনা! চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে আছে। বাংলা স্যার ক্লাসে ঢুকে রামুকে চুপচাপ দেখে বললেন, কি রে রামু, আজ এতো শান্ত যে! এতো শান্ত হতে তোকে কে শেখাল।

বিল্টু বলে উঠল, স্যর, ওর রামছাগল।

ক্লাসে হো হো করে হাসির ঝড় উঠল।

তবু রামু চুপ। আমরা অবাক! ও যেন সত্যি শান্ত হয়ে গিয়েছে। আমরা বুঝতে পারলাম রামুর মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। ঠিক এই রামুকেই আমরা চাইছিলাম।

ছবি : সঞ্জয় সরকার

নানা স্বাদের বই

অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মুখোশ ১৬.০০
রাধারমণ রায়ের
রণডাকাত ২৬.০০

দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুর্গ পাহাড়ে বন্দী ২০.০০
সুভাষ ধরের
বুদ্ধমূর্তির সন্ধানে ৩০.০০

চিত্তরঞ্জন মাইতির
রুরু ৩৫.০০
ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর
ফাঁসি ২৫.০০

ভ্রমণ কাহিনী

রাধারমণ রায়ের
কলকাতা বিচিত্রা ৫০.০০

প্রণবেশ চক্রবর্তীর
এই বাংলায়
১ম ও ২য় খণ্ড ৫০.০০

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গুহা মন্দিরের দেবী ২৮.০০

উপন্যাস

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেবী ৩৬.০০

আনন্দ বাগচীর
অদৃশ্য মৃত্যুর ছক
৪০.০০

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর
ডাক্তারের ডায়েরি
৩৫.০০

শিপ্রা দত্তর
গেস্ট হাউসের ডায়েরি ৪০.০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড ■ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

কেরিয়ার গাইড

ডি. এ. চন্দ্রণ

স্বনিযুক্তির নানা প্রশিক্ষণ

এবার আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠিপত্র পেয়েছি। সেসব থেকে বেছে কয়েকটি চিঠির উত্তর দিচ্ছি। কেননা এসব চিঠি উত্তর অনেকটাই তথ্যমূলক এবং এই উত্তর থেকে অন্যান্য তরুণ পাঠক-পাঠিকার উপকার হবে বলে মনে করি।

নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে সমরেন্দ্র চৌধুরী চিঠি পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা, তিনি জুতো উৎপাদনের ইউনিট খুলবেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ। তাঁর চিঠির জবাবে জানাই, দক্ষিণ ২৪-পরগনার বজবজে রয়েছে সেন্ট্রাল ফুটওয়্যার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। এখানে ফুটওয়্যার সংক্রান্ত তিনটি কোর্স করানো হয়। যেমন—(১) ওপেন টাইপ ফুটওয়্যার কোর্স। আবশ্যিক যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ। ৬ মাসের কোর্স। কোর্স ফি ৩০০ টাকা। (২) ফুটওয়্যার ডিজাইনিং কোর্স—এখানেও আবশ্যিক যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ। কোর্সটি এক বছর মেয়াদের। কোর্স ফি ৪৭০০ টাকা। (৩) অ্যাডভান্স ফুটওয়্যার টেকনোলজি কোর্স—এই কোর্সটি দু'বছর মেয়াদের কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে গেলে প্রার্থীকে কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হয়। কোর্স ফি ৮৫০০ টাকা। এইসব কোর্সে ভর্তির জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় জুলাই/আগস্ট মাস নাগাদ। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়—সেন্ট্রাল ফুটওয়্যার ইনস্টিটিউট, বজবজ (পূজালি মিউনিসিপ্যালিটির পাশে), দক্ষিণ ২৪-পরগনা, ফোন ঃ ৪৮২-০৪৫৩।

ফোটোগ্রাফি কোর্স সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন সবিতা সান্যাল, মেদিনীপুর থেকে। হ্যাঁ, আপনার চিন্তা-ভাবনা খারাপ নয়। ফোটোগ্রাফি করে ভালো আয়ের সংস্থান হতে পারে। পত্রিকা দপ্তরে, আকাশবাণী কিংবা দূরদর্শনে বা সরকারি দপ্তরেও চাকরির সুযোগ আছে। তাছাড়া বিয়েবাড়ি, অনুষ্ঠান, স্টুডিও খুলে নানা ছবি তুলে ভালো আয়ের সংস্থান করা সম্ভব। এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া যেতে পারে—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ ঠিকানায়। তাছাড়া ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব দমদম, ৪৬৭/৮০, যশোহর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭৪; সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফোটোগ্রাফি, ৯৪, শ্যামবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪; ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেলঘরিয়া, ৪৩৪, নীলকান্ত চ্যাটার্জী লেন, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৫৬; ইনস্টিটিউট অব ফোটোগ্রাফি, ১বি, বেচারাম চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৫; রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিন্টিং টেকনোলজি, কলকাতা-৭০০ ০৩২ ঠিকানায় (কমার্শিয়াল ফোটোগ্রাফি) প্রশিক্ষণ নেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই বেশ যত্নসহকারে ফোটোগ্রাফি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আজকাল কমার্শিয়াল ফোটোগ্রাফি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফোটোগ্রাফি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভালো চাহিদা রয়েছে। সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে পাড়ায় স্টুডিও খুলেও ব্যবসা আরম্ভ করা যেতে পারে।

বিউটিশিয়ান কোর্সের এখন দারুণ চাহিদা। অনেকেই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিউটিশিয়ান শপ খুলে বসেছেন। বিশেষ করে মা-বোনেরা নিজেরা যদি এইসব উদ্যোগের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে ওঠেন তাহলে খুবই ভালো লক্ষণ।

এ বিষয়ে আজকাল কলকাতার অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অনেকে আবার নিজেরা ভালোভাবে শিখে অন্যদের হাতে-কলমে কাজ শিখিয়ে দিচ্ছেন। বিউটিশিয়ান কোর্স করানোর ক্ষেত্রে সবচাইতে নামী প্রতিষ্ঠান হলো—শেহনাজ হার্বাল। এখানকার কোর্স পরিচালনা করেন শ্রীমতি ধৃতি ইরানি। ঠিকানা ঃ ফ্ল্যাট ১জি, এমব্যাসি, ৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭১। এটি আড়াই বছরের অর্থাৎ ৩০ মাসের কোর্স। কোর্স ফি প্রায় ৭০০০ টাকা। এখানে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে সৌন্দর্যচর্চা শেখানো হয়। যোগাসন ও হার্বালচর্চার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ছাত্রীরা ফাইনাল পরীক্ষায় বসার সুযোগ পান। ফাইনালে মৌখিক, লিখিত এবং প্র্যাকটিক্যাল তিন ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়। সফল ছাত্রীদের উওমেন্স ওয়ার্ল্ড স্কুল অব বিউটি থেরাপির সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই কোর্সের ক্ষেত্রে আবশ্যিক শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ। তবে স্নাতক হলে আরও ভালো। ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা দরকার।

এছাড়া প্রশিক্ষণের জন্য আরও দু-একটি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা জানিয়ে দিচ্ছি। যোগাযোগ করা যেতে পারে—ইনস্টিটিউট অব হেয়ার ড্রেসিং অ্যান্ড বিউটি কালচার, ১৯১/১, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২। কিংবা ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭।

সব শেষে চৈতালী ঘোষ নৈহাটি থেকে জানতে চেয়েছেন ঘর সাজানোর পেশার প্রশিক্ষণ বিষয়ে। ঘর সাজানোর হাজাররকম উপকরণ আছে। ফুল, প্লাসটিক, আরও কত কী। বুদ্ধি খাটিয়ে নানা ধরনের জিনিস সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং সেসব অনায়াসে গৃহসৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। প্রশিক্ষণের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে—বি সি ২৪৯, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৬৪ ঠিকানায়। এখানে সপ্তাহে দু'দিন শেখানো হয়। তাছাড়া ৭৬ এ, সুইন হো লেন, কলকাতা-৭০০ ০৪২ ঠিকানায় ফুল তৈরির কোর্স শেখানো হয়। তিনটি কোর্স। প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ চার সপ্তাহ। দু' ঘণ্টা করে সপ্তাহে ২ দিন শেখানো হয়। আজ এই পর্যন্ত। আরও চিঠির অপেক্ষায় রইলাম। অন্য বন্ধুদের উত্তর পরের সংখ্যায় দেব।

মরে কাঠ হয়ে গেল

কমল চট্টোপাধ্যায়

সে আজ অনেক দিন আগের কথা। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর যেতে ডানদিকে কিছুটা দূরে একটা পাহাড় আছে, যে পাহাড়ের ধার পর্যন্ত পাক্কেৎ বাঁধের জল আসে। যখনকার কথা বলছি, তখন সেখানে আজকের মতো কিছুই ছিল না। বড় বড় গাছের জঙ্গলে ঘেরা ছিল পাহাড় আর তার চারপাশ। তারই মাঝে ছিল ছোট ছোট কয়েকটা গ্রাম। সব শ্রেণীর মানুষই থাকতো সেখানে। তবে তারা সবাই ছিল বড্ড গরীব। কষ্টে-সৃষ্টে কোনোমতে দিন কাটত। অভাবের তাড়নায় অনেকে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে আনত, তারপর দূরের গ্রামে সেগুলো বিক্রি করে কোনোক্রমে তাদের নুন-ভাত জোটাত। চাষ যে একেবারে হতো না তা নয়, তবে পাহাড়ী এলাকা, বৃষ্টি যখন হয় তখন প্রচুর, তারপরই সব শুকনো। একটু-আধটু জমিতে চাষীরা ধান লাগাত, কিন্তু ফলন তেমন নয়। ফলে অভাব থেকেই যেত।

সব থেকে বেশি কষ্টে ছিল গ্রামের ব্রাহ্মণরা। এরা না পারে কাঠ কাটতে, না পারে জমি চাষ করতে। এইরকম এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আর তার স্ত্রী এক সন্ধ্যায় ঘরের দাওয়ায় শুকনোমুখে বসে আছে। সামনে একটা লম্ফ জ্বলছে। উঠানের একধারে শশার মাচা। তাতে শশা ধরেছে অনেক। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী গ্রামের পাঁচজনকে গাছের শশা দেয়, নিজেরা খায়। সেই শশার মাচার কাছে হঠাৎ কিসের আওয়াজ শুনে ব্রাহ্মণ লম্ফটা নিয়ে এগিয়ে যায়। দেখে, কতকগুলো শেয়াল। এই মোটা মোটা তাদের চেহারা। ব্রাহ্মণকে দেখে শেয়ালগুলো বেড়া ভেঙে, মাচা ভেঙে পালিয়ে গেল। শেয়ালগুলো তো গেল, কিন্তু ভাঙা মাচার নিচে কুঁই কুঁই আওয়াজ উঠছে কেন? ব্রাহ্মণী এবার উঠে এল। লম্ফ তুলে ধরে ভাঙা মাচা সরাতেই দেখলে ছোট্ট একটা শেয়ালছানা। বড়রা পালিয়ে গেছে, ও বেচারি চাপা পড়েছিল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ছানাটাকে বের করে আনল। নেহাৎই ছোট্ট ছানাটা। ব্রাহ্মণী বলল, আমাদের তো ছেলেপুলে নেই, আমি এটাকে মানুষ করব।

পরদিন থেকে শুরু হলো মজার সব কাণ্ডকারখানা। কুকুর, হাতি, বনমানুষকে যেমন শেখানো হয়, শেখানো হয় মানুষের মতো আচরণ করতে তেমনি ব্রাহ্মণীও শেয়ালছানাটাকে ট্রেনিং দিতে লাগল। আস্তে আস্তে শেয়ালছানা বড় হলো। ব্রাহ্মণকে বাবা আর ব্রাহ্মণীকে মা বলতে শিখল। সে দেখে তার বাবা-মার বড় কষ্ট, বড় অভাব। ভাল খেতে পায় না, পরতে পায় না। তাই সে ব্রাহ্মণকে বলল, বাবা, আমি তো এখন বড় হয়েছি, গায়েও জোর হয়েছে। তুমি আমাকে একটা কুড়ুল দাও, আমি গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে কাঠ কাটতে যাব। যা পারি নিয়ে আসব। বিক্রি করে কিছু তো হবে।

কি আর করে ব্রাহ্মণ, তাকে মত দিতেই হলো। তবে যারা কাঠ কাটতে যায় তাদের সে বলে দিল, দেখিস বাবা, একটু নজর রাখিস। ওর যদি কিছু হয় ব্রাহ্মণী আর বাঁচবে না।

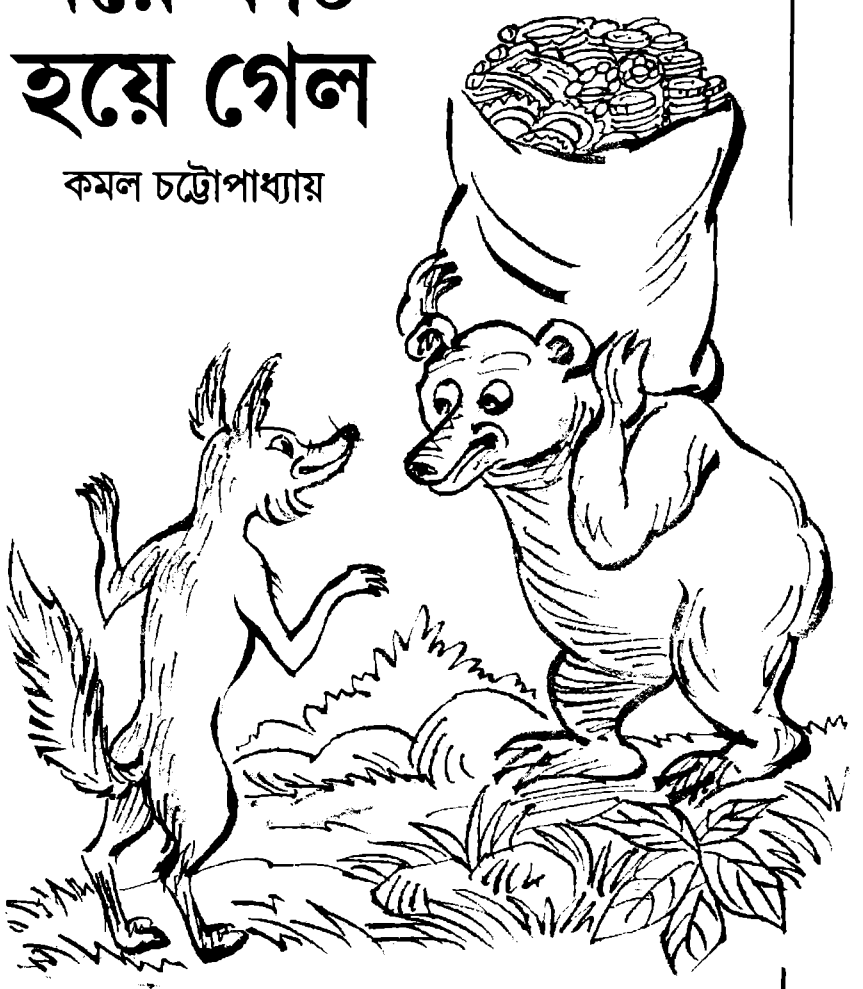

তোর দিদির কি হয়েছে?

কয়েকদিন জঙ্গলে যাতায়াত করে শেয়াল বেশ পারদর্শী হয়ে উঠল। এখন মাঝে-মাঝে দল ছেড়ে সে একাই গভীর জঙ্গলে চলে যায়। জঙ্গলের মধ্যেও সব নিয়ম-কানুন আছে। সেখানে কোনো অঞ্চলটা ভালুকের, কোনোটা হায়নার আবার কোনোটা নেকড়ে বাঘের। একদিন ঘুরতে ঘুরতে শেয়াল ভালুকের রাজত্বে ঢুকে পড়ল। এধার-ওধার করতে করতে আচমকা তার নজরে পড়ল দূরে পাতার ছাউনি দেওয়া একটা ঘর। শেয়াল সোজা ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। ভেতরে গিয়ে তো সে অবাক! কত গয়না-গাঁটি, টাকা-পয়সা স্তূপাকার করে রাখা। শেয়াল ভাবে এত সব এল কোথা থেকে? কার-ই বা জিনিস এগুলো! আকাশ-পাতাল ভাবে আর ভাবে, কোনো কূল-কিনারা পায় না। এমন সময় সেখানে হাজির হয় কয়েকটা ভালুক। তাদের দেখেই শিয়াল টুক করে লুকিয়ে পড়ে সোনা-রুপোর স্তূপের আড়ালে। চুপি-চুপি শোনে ভালুকদের কথাবার্তা। বুঝতে পারে ও যেখানে এসেছে সেটা ভালুক রাজার বাড়ি।

শেয়াল তখন করল কী কষ্টে-সৃষ্টে ঘরের পিছনের এক ফোঁকর গলে বাইরে বেরিয়ে ঘরটা ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে দরজার সামনে। তাকে দেখেই দুটো ভালুক ছুটে এল। কষে পাকড়ে ধরে ধমকে উঠল, কে রে তুই? শীগগির বল নইলে এখুনি মেরে ফেলব। অমনি পাশ থেকে আরেকটা তাগড়াই ভালুক টিপ্পনী কাটল, ব্যাটা নিশ্চয় বদমাশ নেকড়েটার চর।

শেয়াল কিন্তু ধীরে-সুস্থে উত্তর দিল। বলল, আমি চরও নই, চোরও নই। আমি এসেছি জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। দশ দিন ঘুরে ঘুরে তবে আজ তার সন্ধান পেয়েছি।

জামাইবাবু! সবাই তো অবাক। কে তোর জামাইবাবু?

কেন ভালুকরাজা আমার জামাইবাবু। তাঁকে খবর দাও। কোথায় তিনি? দিদির খুব অসুখ। কতদিন থেকে ঘুরছি। দিদি আমাকে পাঠাল, বললে, একবার যা ভাই, তোর জামাইবাবুকে খবর দে। মরার আগে একটু পায়ের ধুলো নিয়ে মরতে চাই। তাই এসেছি।

পাহারাদার ভালুক দুটো প্রথমে অবাক হয়ে শুনছিল। এবার ভাবতে বসল। একজন বলল, বস, এখুনি রাজা আসবে। খেয়েছিস কিছু? না খাস তো ভেতর ঘরে যা, একটা মুরগী আছে, খা। আমরা তো ওসব খাই না। শেয়ালছানা বলল, না। এখন কিছুই খাব না। জামাইবাবুর সঙ্গে আগে দেখা হোক। ওদের কথাবার্তা হতে হতেই দলবল নিয়ে ভালুকরাজা এসে গেল। একজন পাহারাদার ভালুককে নিবেদন করল, রাজামশাই, আপনার শ্যালক এসেছেন গ্রাম থেকে। আপনার স্ত্রীর নাকি খুব অসুখ। ভালুকরাজা আকাশ থেকে পড়ল, আমার স্ত্রী! তাও বলছে গ্রামে বাড়ি! কই? দেখি তো কে এসেছে?

শেয়াল ছুটে এল কাঁদতে কাঁদতে। ভালুকের পা জড়িয়ে ধরে কঁকিয়ে উঠল, ওগো জামাইবাবু গো, কত কষ্টে তোমার দেখা পেলাম গো।

ভালুক তো হতভম্ব। কি করবে না করবে বুঝতে পারছে না। কবেই বা বিয়ে করেছে, বৌটাই বা কেমন, কিছুই তো মাথায় আসছে না। আবার ভাবল, আমরা তো বুনো, এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই; হয়তো কোনো সময়ে বিয়ে করেছি এখন ঠিক মনে পড়ছে না। তা যদি হয় তাহলে তো স্ত্রীর ওপর খুব অন্যায় করেছি। তাই আস্তে গলা নামিয়ে বলল, তোর দিদির কি হয়েছে?

জামাইবাবু! কি বলব, তোমার কথা ভেবে ভেবে দিদি শয্যাশায়ী। তুমি একবার চল।

শোন ভাই, আমি কী করে যাব বল। তোর দিদির প্রতি কত অন্যায় করেছি, একবার তার খোঁজও নিইনি। আমার জন্যই এখন তার এই অবস্থা। বল কী করে আমি তার সামনে যাব।

তোমাকে যেতে হবে না জামাইবাবু। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে শুনলেই দিদির আদ্ধেক রোগ সেরে যাবে। চিকিৎসা তো করছি, একটু ভাল হলেই নিয়ে আসব।

ভালুক জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে, চিকিৎসা করতে তো অনেক খরচ হচ্ছে। তুই বরং আমার কাছ থেকে কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে যা। আমারও তা দেওয়া উচিত।

ভালুকরাজার নির্দেশে আরেকটা ভালুক এক বস্তা সোনাদানা, টাকা-পয়সা নিয়ে এল। সেই বস্তা ঘাড়ে করে সে চলল শেয়ালকে তার বাড়ি পৌঁছে দিতে। কিন্তু গ্রামের কাছাকাছি এসে শেয়াল তাকে বিদেয় করে দিল। বলল, তোমাকে আর আসতে হবে না। এখান থেকে আমিই বস্তাটা নিয়ে

যেতে পারব।

এদিকে রাত হয়েছে। শেয়ালের জন্য ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ভেবে-ভেবে অস্থির। এমন সময় তারা দেখল মস্ত এক বস্তা ঘাড়ে শেয়াল বাড়ি ঢুকছে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ভাবল শেয়াল বোধহয় অনেক কাঠ কেটে এনেছে। তারপর যখন আসল কথা জানতে পারল তখন দু'জনেই ভয়ে আধমরা। শেয়াল তাদের অভয় দিল, কিচ্ছু ভেব না তোমরা, যা করার আমি করব। তোমরা বরং বাড়িটা ঠিক করো আর কিছু ধানজমি কিনে নাও। গাঁয়ের কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে আমি জঙ্গলে গুপ্তধন পেয়েছি।

—কিন্তু ভালুকরাজা যদি কোনোদিন এসে যায়?

—তাই আবার আসে নাকি? ওসব ভাবতে হবে না। তোমাদের যা বললাম তাই করো।

গ্রামের লোক জেনে গেল ব্রাহ্মণ জঙ্গলে প্রচুর ধনদৌলত পেয়েছে। অল্পদিনেই তার পাকা বাড়ি হলো, জমি-জায়গা, গোয়াল, গরু-বাছুর কেনা হলো। একদিন শেয়াল বলল, মা, আমি আর একবার জঙ্গলে যাব। শুনে তো ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হাঁ-হাঁ করে উঠল।

শেয়াল কিন্তু ভয় পেল না। সে দিব্যি পরের দিন সকালে সোজা ভালুকরাজার ঘরে উপস্থিত। রাজা তখন ঘরেই ছিল। শেয়ালকে দেখে খুব খুশি।

আয়, আয়, বোস। তারপর, তোর দিদি কেমন আছে?

আগের থেকে অনেক ভাল। তোমার সব কথা শুনে ছটফট করছে আসবার জন্যে, কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ। ডাক্তার বলল, 'শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে একবার কলকাতায় গিয়ে বড় ডাক্তার দেখিয়ে নিতে। সেই সব বলতেই এলাম।

হাঁ রে, তা কি যেন বললি? কলকাতা, সেখানে যেতে হবে—ডাক্তার, ওষুধ, অনেক খরচ হবে তো। ভাই, আমি তো কিছুই করছি না, তুই আর কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে যা। ভাল করে সুস্থ করে, তারপর নিয়ে আসবি।

এরপর আগের মতোই একটা ভালুক আর এক বস্তা টাকা গ্রামের ধার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল।

আবার টাকা! ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ভয়ে মরে যায় আর কি। শেয়াল করছে কি?

হাত-মুখ ধুয়ে শেয়াল বলল, বাবা, এবার আমাদের একটা কাজ করতে হবে। তুমি কাল সকালেই একজন ভাল কাঠের মিস্ত্রিকে দিয়ে একটা প্রমাণ সাইজের পুতুল তৈরি করাও। দেখতে যেন মা লক্ষ্মীর মতো হয়। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তো বলবে, পুজো হবে।

দিন সাতেকের মধ্যেই কাঠের একটা পুতুল তৈরি হয়ে গেল। দেখতেও খুব সুন্দর। শেয়াল তখন সেই পুতুলটাতে কাপড় পরিয়ে ঘোমটা দিয়ে কাঁধে করে চলে গেল ভালুকরাজার বাড়ি। গিয়ে বাইরের ঝোপে লুকিয়ে থাকল। যখন ভালুকরাজা ঘর থেকে বের হলো, অমনি পুতুলটাকে ঘরের ভেতরে ঠেস দিয়ে রেখে দিল। তারপর 'জামাইবাবু', 'জামাইবাবু' বলে চেঁচাতে লাগল। যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই সে বলে, আমার জামাইবাবু কোথায় গো, দিদি এসেছে। কিছুক্ষণ এইরকম ঘোরাঘুরি করে সে এসে ভালুকরাজার ঘরের পাশে একটা ঝোপে লুকিয়ে থাকল।

ওদিকে, খবরটা একসময় ভালুকরাজার কানে গেছে। ভালুকরাজা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল। এসেই দেখে পরমাসুন্দরী এক মানুষের মেয়ে তার ঘরে। প্রথমটা সে খুব ঘাবড়ে গেল। মনেই পড়ছে না, যে এইরকম একটা মেয়েকে সে বিয়ে করেছিল। তারপরই ভাবল, আমি হয়তো কোনো সময় বিয়ে করেছিলাম। ইস কত অন্যায় করেছি! কত ভাল মেয়ে, স্বামী ভালুক, তাও এসেছে। তাই তাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে লাগল—আমি খুব অন্যায় করেছি। তোমাকে ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর অসুখের খবর শুনে আরো খারাপ লাগছিল। যাক খুব ভাল করেছ এসে। কিছু খেয়েছ? কাঠের পুতুল কোনো উত্তর দেয় না। ভালুক আবার বলে, এ তো তোমারই ঘর। লজ্জার কি আছে? এইগুলো খাও—বলে কলা, আম, আপেল নিয়ে পুতুলটার সামনে রাখল। নাও, খাও।

কে খাবে? কাঠপুতুল কি খেতে পারে? ওধারে ভালুক সমানে অনুরোধ করেই যাচ্ছে। কিন্তু কোনো সাড়াও নেই, শব্দও নেই। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে যাওয়ার পর ভালুক আর ধৈর্য রাখতে পারল না। মারল এক চড়। ধাক্কা খেয়ে কাঠপুতুল পড়ে গেল। ভালুক ভয়ে তটস্থ। একি হলো? এঃ! চড়টা খুব জোরে হয়েছে। এ কী করলাম! আর ঠিক সেইসময় শেয়ালও ঘরে ঢুকল।

দিদি, জামাইবাবু কই গো? একি? দিদি এমনভাবে পড়ে কেন? দিদির কি হলো? একি? এ যে শক্ত কাঠ। জামাইবাবু—

ভালুকরাজা কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে, ওরে ভাই, আমি পাপী, আমি রেগে গিয়েই.....বেচারি পড়ে গেল, আর মরে গেল একেবারে.....। এ আমি কী করলাম! নিজের বৌকে মেরে ফেললাম!

শেয়াল এতক্ষণ কাঁদছিল। এবার লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে লাগল, ওগো কে কোথায় আছ, দেখে যাও, আমার দিদিকে জামাইবাবু মেরে ফেলেছে। ওগো, আমি মা-বাবাকে কি বলব গো! কত আশা করে দিদি এলো গো.....।

ভালুক তাড়াতাড়ি শেয়ালের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। আর কাঁদিস না ভাই। জঙ্গলে আমার আর সম্মান থাকবে না। এক কাজ কর, তোকে আরও এক বস্তা টাকা-পয়সা, সোনা-দানা দিচ্ছি, তাই নিয়ে তুই বাড়ি ফিরে যা।

তারপর?

তারপর আর কি, মা-বাবাকে নিয়ে শেয়াল আরামে আয়েশে দিন কাটাতে লাগল। আর কোনোদিনও সে জঙ্গলমুখো হয়নি। আর ওদিকে বউকে মেরে ফেলার লজ্জায় ভয়ে ভালুকরাজা তার রাজ্যপাট গুটিয়ে সেখান থেকে উধাও।

ছবি: সুফি

চোরের উপর বাটপাড়ি, পকেটমারের উপর...

পিনাকী রঞ্জন দাশ

হাঁচ্চো!

কেউ হেঁচে উঠল। বোম্বেটে মার্কা, বিকট হাঁচি। মনে হলো হিরোসিমায় অ্যাটম বোম পড়ল।

বারান্দায় বসে 'সুদকষা' কষছিলাম। হাত তিনেক দূরে ছোটকা বসেছে দাড়ি কামাতে। পাশে গরম চায়ের কাপ। ধোঁয়া উড়ছে। যত্ন সহকারে দাড়িতে সাবান মাখাচ্ছিল ছোটকা। পোক্ত হাতের আলতো আলতো দোলায় সাবানের ব্রাশ ক্রমশ সফেন করার তুলছিল তার চোয়াল। এমন সময় বিকট এই হাঁচি। মুহূর্তে কেঁপে উঠল সাবধানী, পোক্ত হাত। ব্রাশ বিট্রে করল। ছোটকার খড়্গের মতো খাড়া নাক আর ডান চোখ ঢেকে গেল সাবানের একগুচ্ছ ফেনায়।

এদিকে, অচানক এই বিকট হাঁচির উৎস সন্ধানে পেছন ঘুরতেই আমার ঘূর্ণায়মান ডান পায়ের ছোট্ট একটা টোকায় ছিটকে গেল ছোটকার চায়ের কাপ। একেবারে বারান্দার নিচে, যেখানে বসেছিল ভুলো। আমাদের, বিশেষ করে ছোটকার আদরের কুকুর। সারারাত্রি সতন্দ্র পাহারার পর একফালি রোদে, সামনের দুই পায়ের মাঝখানে মাথা রেখে রাতের ঘুমটার জাবর কাটছিল। গরম চা পরিপূর্ণ সেই কাপ গিয়ে পড়ল এক্কেবারে ভুলোর মাথায়। 'কেঁউ' করে একটা আওয়াজ এল, তারপর দেখলাম তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ফটাফট শব্দে কান মাথা ঝেড়ে তীরবেগে কুয়োতলার দিকে ছুটল ভুলো। কুয়োতলায় হারানের মা বাসন মাজার জন্য কুয়ো থেকে জল তুলছিল। রকেটের গতিতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য ভুলো ছুটে গিয়ে আটকে গেল হারানের মা'র দু-পায়ের ফাঁকের শাড়িতে। বাবাগো-মাগো বলে লাফিয়ে উঠল হারানের মা। দড়ি সমেত বালতি গেল কুয়োয়। হারানের মা'র তিড়িং বিড়িং লাফ অথবা বাবাগো-মাগো চিৎকার, যাতেই হোক, প্রবল ঘাবড়ে গিয়ে ঘেউ ঘেউ ডাকে বাড়ি মাথায় করে তুলল ভুলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এতসব ঘটে গেল।

কুয়োতলায় হারানের মা'র কথক, তার সঙ্গে ভুলোর ঘেউ ঘেউ বোল বাণী, এই অকৃত্রিম যুগলবন্দীর প্রেক্ষাপটে দেখতে পেলাম, ফেনামুক্ত এক চোখে ডবল দুর্বাসার দৃষ্টি নিয়ে, ছোটকা জেঠুমণির ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। আর দরজার ফ্রেমে অসাধারণ এক ছবির মতো আটকে আছেন জেঠুমণি। হাঁচির চোটে কোমর থেকে পতনোন্মুখ লুঙ্গিটা বাঁ হাত দিয়ে কোনোরকমে শরীরের সঙ্গে চেপে রেখেছেন, ডান হাত মুখের সামনে। নাক-মুখ কুঁচকে, চোখ বন্ধ করে, জেঠুমণি প্রতীক্ষা করছেন সেকেন্ড হাঁচিটার।

দাঁতে দাঁত চেপে গর্জন করে উঠল ছোটকা। স্টপ ইট! স্টপ ইওর আন-সিভিলাইজড হাঁচি।

জেঠুমণির সেকেন্ড হাঁচি আর হাঁচা হলো না। টান টান হয়ে গেল ছ-ফুট লম্বা শরীর। দ্বিগুণ জোরে গর্জন শোনা গেল, হোয়াট!

শরীরের ঝাঁকুনিতে বাঁ-হাতের মুঠো খসে লুঙ্গি প্রায় পদানত হচ্ছিল। খপ করে ধরে ফেললেন জেঠুমণি। ভুঁড়ির নিচে কোনোরকমে গিঁট দিয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, হোয়াট ডু য়ু মিন বাই আনসিভিলাইজড হাঁচি? কি বলতে চাও তুমি? কে আনসিভিলাইজড? আমি, না আমার হাঁচি?

তুমি আর তোমার হাঁচি উভয়েই।

প্রমাণ দাও।

প্রমাণ তোমার চোখের সামনেই।

কিরকম?

তোমার হাঁচিতে আমার হাত কেঁপেছে। নাকে-চোখে সাবানের ফেনা ঢুকেছে।

তুমি ভীতু, কাপুরুষ তাই। অল্পেতেই তুমি কেঁপে ওঠো।

শিল্টু চায়ের কাপ উল্টেছে।

তোমার শিষ্য, তোমার মতোই ভীতু।

ভুলো যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছে।

তোমার কুকুরের কাছে এর থেকে আর কী-ই বা আশা করা যেতে পারে! ওর ক্ষেত্রেও একই বিশেষণ প্রযোজ্য।

ও, আমরা সবাই ভীতু, কাপুরুষ! তুমি একই ডেয়ার ডেভিল।

অবশ্যই। তুমি বোধহয় জান না যখন আমি তিলজলা থানার দারোগা ছিলাম তখন কুখ্যাত সব আসামী আমার নামে থরহরি কম্প খেত। আর এখন রিটায়ারের পর তোমাদের কাঁপাচ্ছি।

দেখ বড়দা, তোমার আচরণ দিন দিন ডেভিলের মতোই হয়ে উঠছে। কোনো সভ্য মানুষ তোমার সঙ্গে বসবাস করতে পারে না। এমনকি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করাও—কি যেন বলে—ইয়ে ভদ্রতার অবমাননা।

ঠিক আছে, বাক্যালাপ কোর না। তোমার মতো মুষিক হৃদয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ আমার মতো পুরুষ সিংহের পক্ষে খুবই অপমানজনক।

বেশ, তবে আজ থেকে তোমার আমার কথা বন্ধ।

বাঁচা যাবে। কিন্তু ভাইপোটাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, ওকে আমি প্রকৃত পুরুষ তৈরি করব। তোমার মতো মিনমিনে বাবু নয়।

এই হয়েছে আমার মুশকিল। মাঝে মাঝেই দুই ভাইয়ের তর্কাতর্কি হয়, আর শেষ হয় আমার ওপর অধিকার ভাগাভাগি নিয়ে। যাই হোক, দুই ভায়ের মধ্যে কিন্তু আবার ভাব হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলাতেই। কিভাবে? এবার সেটাই বলব।

বিকেল বেলা জেঠুমণির সঙ্গে ময়দানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। রবীন্দ্রসদন ঘুরে ২৩০ নম্বর বাসে উঠেছি। বসার জায়গাও পেয়ে গেছি, বাসের একদম পেছনের সিটে। মল্লিকবাজার পার্ক স্ট্রিটের কাছে এসে বাস প্রায় ভর্তি হয়ে গেল। হঠাৎ আমার নজর পড়ে গেল সামনের দিকে। আরে ছোটকা না! তাই তো, বাসের হ্যান্ডেল ধরে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। জেঠুমণিকে বললাম, জেঠুমণি ঐ দেখ ছোটকা। জেঠুমণি বললেন, দেখেছি। আমি বললাম, ডাকব ছোটকাকে? জেঠুমণির সংক্ষিপ্ত জবাব, 'না'। তারপর বললেন, ছোটকুর পাশে ঐ লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরা লোকটার দিকে নজর রাখ।

আমি তাকিয়ে দেখলাম ছোটকার গা ঘেঁষে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। লোকটার চোখের চাহনি আমার ভাল ঠেকল না। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ পার হয়ে বাসটা একটু এগোতেই দেখলাম লোকটা গেটের দিকে এগিয়ে এল। আর তখনই ঘটল এক বীভৎস কাণ্ড।

জেঠুমণি আবার হাঁচলেন। মনে হলো সকালের সেই ডিউ থাকা সেকেন্ড হাঁচিটা। হাঁচির দমকে জেঠুমণি স্প্রিং-এর মতো বাসের সিট থেকে ছিটকে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সেই লুঙ্গিপরা লোকটার ঘাড়ে। সেকেন্ডের মধ্যে দেখলাম জেঠুমণি ডান হাতের তুখোড় হাতসাফাইয়ে লোকটার পাঞ্জাবির ঝুলপকেট থেকে কালো রংয়ের একটা মানিব্যাগ তুলে নিয়ে, নিজের পকেটে ভরে ফেললেন। আমি বাদে আর সকলের অজান্তেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

এদিকে বাসসুদ্ধু লোক সেই পিলে চমকানো হাঁচি আর হুমড়ি খেয়ে পড়ার শব্দে সেদিকে ফিরে তাকাল বটে কিন্তু আসল ব্যাপারটা কেউ ধরতে পারল না। দেখলাম ছোটকাও কটমট করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমাদের দেখতে পেয়েছে। অবাক করা কাণ্ড, লুঙ্গিপরা লোকটা জেঠুমণিকে কিছু বলল তো না-ই বরং বাস থামতেই সুট করে নেমে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল। জেঠুমণি কোনো মতে নিজেকে ঠিকঠাক করে নিয়ে আবার সিটে বসে পড়লেন।

আমার উত্তেজনা তখন চরমে। জেঠুমণি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে কানে কানে বললেন, কোনো কিছু দেখে থাকলে চেপে যা। তাঁর বলার ধরনে আমি চুপ করে গেলাম। কিন্তু মনের ভেতর তোলপাড় হতে থাকল। জেঠুমণি শেষ পর্যন্ত পকেট মারলেন!

যাই হোক আমাদের স্টপেজে আমরা নামলাম। ছোটকাও নামল আমাদের সঙ্গে। কথা না বলে গনগনে মুখে হনহন করে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। আমি বুঝতে পারলাম রাতে অঙ্ক ভুল হলে আমার কি হালৎ হবে। জেঠুমণি আমাকে বললেন, চল, পরশুরামের দোকান থেকে গরম রসগোল্লা নিয়ে যাই। ছোটকুটা গরম রসগোল্লা বড় ভালবাসে। আমি বললাম, কিন্তু জেঠুমণি, ছোটকা কি তোমার নিয়ে যাওয়া রসগোল্লা খাবে? জেঠুমণি বললেন, আলবাৎ খাবে? আজ যে ওকে খেতে হবেই।

রসগোল্লা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ফিরে দেখি হুলুস্থুল কাণ্ড। ছোটকা বারান্দায় থেবড়ে বসে পড়েছে। অফিসের জামা-প্যান্ট কিছুই ছাড়েনি। কাঁদ কাঁদ মুখ। ছোটকাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বাবা, মা, কাকীমা সবাই।

সদর দরজা দিয়ে জেঠুমণি ঢুকতেই বাবা বললেন, সব্বোনাশ হয়ে গেছে বড়দা। ছোটকুর পকেটমারা গেছে। মাইনের পুরো পাঁচ হাজার টাকা।

জেঠুমণি শান্তভাবে উত্তর দিলেন, তাই বুঝি! তারপর একটু থেমে ছোটকার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছোটকু গরম রসগোল্লা এনেছি, খাবি?

আগুনে যেন ঘি পড়ল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল ছোটকা, দেখ বড়দা, ইয়ের একটা সীমা আছে। অফিসে বেরুনোর সময় তুমি ওরকম অলুক্ষুণে হাঁচি হাঁচলে, বাসের মধ্যে আমাকে দেখে আর একবার। তারপর আমার এই দুর্দশার মধ্যে তুমি এলে রসগোল্লা খাওয়াতে! এই ইয়ারকির মানে কী? বলি এই ইয়ারকির মানে কী? সপ্তমে চড়ল তার গলা। তারপর বাবার দিকে ফিরে বলল, মেজদা, তুমি এর একটা বিহিত করো, নাহলে—শেষের দিকে ছোটকার গলার স্বর কেমন যেন ধরা-ধরা হয়ে গেল। চোখ ছলছল করে উঠল।

অবস্থা বেগতিক বুঝে বাবা জেঠুমণিকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। জেঠুমণি হাত তুলে বাবাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর ছোটকার সামনে গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন। স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, কত টাকা ছিল মানিব্যাগে?

টাকা মানিব্যাগে ছিল তুমি জানলে কি করে? ছোটকার গলায় প্রবল সন্দেহ।

জেঠুমণি কড়া জেরার ঢঙে বললেন, প্রশ্ন আমি তোমাকে করছি, তুমি আমাকে নয়। বল কত টাকা ছিল মানিব্যাগে?

পুরো পাঁচাহাজার।

কত কতর নোট?

পাঁচশো টাকার আটটা আর একশো টাকার দশটা।

মানিব্যাগের রং কি?

কালো।

হুম্, দেখ তো এটা কিনা?

এই বলে আমাদের সকলকে অবাক করে দিয়ে জেঠুমণি পাঞ্জাবির ঝুলপকেট থেকে বের করলেন সেই কালো মানিব্যাগ।

মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। চোরের উপর বাটপাড়ি হয় জানতাম, কিন্তু পকেটমারের উপর কি হয় তা আমার জানা নেই। অনেক চিন্তা করে আজও কিছু বার করতে পারিনি।

ছবি : সুফি

নেই মামার কানা মামা

নারায়ণ সাহা

নেই মামার কানা মামা নয়, কথাটা হচ্ছে,নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। আর শুধু কানা কেন, খোঁড়া কালা বোবা—যে কোনো একটা মামা হলেই আপাতত চলে যেত বুলকির। মামাটা যে এই বয়সেই এত ভাইটাল হয়ে দাঁড়াবে, তা কী বুলকি বুঝতে পেরেছিল তখন! কেন যে ও অঙ্ক স্যারের কাছে মিথ্যে কথা বলতে গেল! একটা মিথ্যের জন্যে যে এতখানি জড়িয়ে পড়তে হবে তা বুঝতে পারেনি।

গতকাল বুলকি ইস্কুলে আসেনি। স্নান খাওয়া সেরে, বইপত্তর নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ঠিকই কিন্তু পথে রাজু, দীপ, তাতাইয়ের সঙ্গে দেখা হতে ওরা ওকে চৌধুরীদের পুকুরে মাছ ধরতে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে, ঝুটমুট ইস্কুল কামাই হয়ে গেল। অঙ্ক স্যার আজ চশমার কোণ দিয়ে একেবারে দৃষ্টিভেদী বাণ বুলকির দিকে সরাসরি নিক্ষেপ করে, গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, কাল কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

বুলকির তখন গলা শুকিয়ে কাঠ। অঙ্ক স্যারের অমন ক্ষয়াটে মার্কা চেহারা হলে কি হবে, কিন্তু তাঁর হাতের লিকলিকে ছড়িটার দিকে তাকালে ক্লাসের সবার বুকের ভেতরটা আপনা থেকেই কেঁপে ওঠে। বুলকির বুক তো আরো বেশি করে কাঁপছিল। স্যারের প্রশ্নের কী জবাব হবে? বুলকি রেডিমেড কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে দুম করে বলেছিল, বেড়াতে স্যার।

কোথায়? দৃষ্টিভেদী বাণ তো ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ক স্যারের হাতের তেলতেলে বেতটা নেচে উঠেছিল এবার। বুলকি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, মামাবাড়ি স্যার।

কোন মামা? অঙ্কের ফরমুলার মতোই দুরূহ প্রশ্ন অঙ্ক স্যারের। বুলকি কিছু বুঝতে না পেরে বলেছিল আবার, নিজের মামা স্যার।

কোথায় থাকেন?

কাছেই। সোনামুখি।

মিথ্যের পর আরো ক'টা মিথ্যে বলে বুলকি নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিল তখন। অঙ্ক স্যার ছড়ি নাচাতে নাচাতে বলেছিলেন, টোয়েন্টিফোর আওয়ারস। এর মধ্যে মামাকে সশরীরে যদি আমার কাছে না আনতে পারিস, তাহলে এই বেত কাল তোর পিঠে ভাঙবো। বোস—।

বেঞ্চির উপর একেবারেই বসে পড়েছিল বুলকি। চোখের সামনে অন্ধকার। ক্লাসের সব কিছু তখন অন্ধকারে ঢাকা। অঙ্ক স্যার, সহপাঠীরা, দেওয়ালের ব্ল্যাকবোর্ড....সব। শুধু অঙ্ক স্যারের হাতের ছড়িটা বুলকির চোখের সামনে ভাসছে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময়। এর মধ্যে সশরীরে মামাকে হাজির করতে হবে। নইলে—

এমন বিপদে বুলকি কোনোদিন পড়েনি। সবে ওর ক্লাস সিক্স। বয়সও এমন কিছু বেশি নয়। আসছে ফাল্গুনে বারোতে পড়বে। এই বয়সে মগজে কতটুকুই বা বুদ্ধি হবে ওর। ও তো ভেবেছিল, অন্য স্যারেরা যেমন করেন, অর্থাৎ ইস্কুলে না আসতে পারলে যেমন বলে দেন, বাড়ি থেকে গার্জেনের চিঠি নিয়ে আসবি কাল। বুলকি তাহলে কাউকে ধরে বেঁধে একটা চিঠি এনে খালাস পেয়ে যেত। কিন্তু অঙ্ক স্যারের চিঠিতে বিশ্বাস নেই। মামাকে সশরীরে হাজির করতে হবে।

অথচ বুলকি জানে, ওর তিন কুলে কোনো মামা নেই। বাবাকেও ও চোখে দেখেনি কোনোদিন। মা এখন পিসেমশাইয়ের সংসারে গলগ্রহ হয়ে আছে। পিসেমশাই যদি ব্যাপারটা জানতে পারেন, তাহলে আরো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে।

কিন্তু মামা একটা চাই। সেও আবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। বুলকি মাকে এসে বলল, আচ্ছা মা, নিজের মামা নাহয় নেই। তা বলে কোনো মামা, ধর, কোনো দূর-সম্পর্কের সেরকমও কী কেউ নেই?

হেমপ্রভা ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারেননি। মামা কেন, যেদিন বুলকি জেনেছে, ও জন্মাবার মাত্র বছর খানেকের মাথায় ওর

বাবা মারা গিয়েছিলেন, সেদিন থেকে ও বাবা সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন তুলতো না। সেই ছেলের আজ কেন যে মামার খোঁজ পড়ল, হেমপ্রভা তা বুঝতে পারলেন না। অথচ ছেলে নাছোড়। হেমপ্রভা অনেক ভেবে তারপর বললেন, সেরকম মামা যে একেবারে নেই, তা নয়। স্টেশনের ওপারে নতুন পাড়ায় গজানন মিত্তির আমাকে খুব দিদি দিদি বলতো। তা, তোর বাবা মারা যাবার পর, সে মানুষটাও কেমন বদলে গেল হঠাৎ।

বুলকির ভেতরকার ধুকপুকুনিটা অনেকটা যেন থেমে গেল এবার। বাব্বা! এতক্ষণ যা চিন্তা ছিল ওর! তবু যা হোক একটা মামার খোঁজ পাওয়া গেল। নাকে মুখে দুটো ভাত গুঁজেই বুলকি ছুটল নতুন পাড়ায়। ওদিকটা ওর চেনা। এখনো বিশেষ বাড়িঘর ওঠেনি। আর, গজানন মিত্তিরের দশাসই চেহারা ও এর আগে দু' একবার দেখেছে। অতএব—

এই ছোঁড়া?

বুলকি মুখ ঘোরাতেই মানুষটিকে চিনতে পারল। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ও যখন ভাবছিল, এতবড় বাড়ির ভেতর ও কী করে ঢুকবে আর গজানন মিত্তিরের সামনে দাঁড়িয়ে কী করেই বা আসল কথাটা পাড়বে, ঠিক তখনই পেছন থেকে বাজপড়ার শব্দ শুনল বুলকি। সামনের বিশাল গেট পেরিয়ে, চোরের মতো বুলকি ক'পা এগিয়েছিল, আর ভেতরে যাওয়া হলো না। মানুষটিকে চিনতে পেরেই, ও খুশি উপছানো গলায় ডেকে উঠল মামা!

সঙ্গে সঙ্গে বিরাশি সিক্কার একটা থাপ্পড় এসে পড়ল বুলকির গালে। গজানন মিত্তির বজ্রনিনাদে হেঁকে বললেন, চোপরাও। মামা! কোথাকার চোর ছ্যাঁচোড় তার ঠিক নেই, মামা! আমি কারো মামা-কাকা নই বুঝলি ছোকরা? ভাগ হিঁয়াসে।

থাপ্পড় খেয়ে চরকির মতো দু' পাক ঘুরপাক খেয়েই বুলকি আর সেখানে নেই। এক ছুটে স্টেশন। এমন সিংহরাশি মামার খপ্পড়ে পড়তে হবে জানলে ও কী এখানে আসতো কখনো? এখন বুলকি বুঝতে পারছে, কেন গজানন মিত্তির মাকে আর দিদি দিদি বলে ডাকে না! কেন সম্পর্ক ছেড়েছে!

থাপ্পড়ের জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতরও খানিকটা জ্বালা নিয়ে বুলকি বাড়ি ফিরে এল। রাজু, দীপ, তাতাইয়ের কাছে গিয়েও কোনো লাভ হয়নি। ওরা সবাই ওর ইস্কুলের বন্ধু। এক সেকশনের নয়, অন্য সেকশনের। কিন্তু অঙ্ক স্যার ওদের কাউকে না ধরে বুলকিকেই পাকড়াল। আর রাজু, দীপ, তাতাই পাঁকাল মাছের মতো কী সুন্দর বেরিয়ে গেল।

মামার বাড়ি বেড়াতে যাবার কথা বলে যে কী ভুল করেছে, ভাবতে গেলেই মনের মধ্যে এখন অনুশোচনা বাড়ছে বুলকির। তার চেয়ে ও যদি বলতো, 'জ্বর হয়েছিল বলে কাল আসতে পারিনি স্যার', তাহলে তো অঙ্ক স্যার মামাকে ডেকে আনতে বলতেন না। বড় জোর বলতেন, মা'র কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে আসবি। এখন কী করে যে মামা যোগাড় হবে!

ভাবনা-চিন্তায় পড়াশুনা শিকেয় উঠল। রাতে ভাল করে ঘুমও হলো না। অঙ্ক স্যারের বেতের মার কাল কেউ ঠেকাতে পারবে না। তার উপর ব্যাপারটা যদি পিসেমশাইয়ের কান অবধি গড়ায়, তাহলে রাগে ক্ষোভে পিসেমশাই হয়তো ওর ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে মাকে বলবেন, কাল থেকে আমার সঙ্গে ওকে দোকানে পাঠিয়ে দিবি হেম। টাকা-পয়সা দিয়ে বাইরের কর্মচারী রেখে লাভ কী! নিজের লোক খাটবে, খাবে।

শেষ রাতের দিকে, সময়ের হিসেব না জানলেও বাইরের অন্ধকার দেখে বোঝা যাচ্ছিল ভোর হতে এখনো বেশ খানিক বাকি, ঠিক সেই সময় বাইরের ঘরে খুটখুট আওয়াজ শুনে বুলকি চমকে উঠল। চোখে ঘুম ছিল না, তাই শব্দটা ওর কানে আগে ঠেকল। মা পাশে অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। দোতলার ঘরে একা পিসেমশাই ঘুমোন। ও ঘরে গেলে পিসেমশাইয়ের নাক ডাকার বিকট শব্দ শোনা যায়। কিন্তু এটা যে নাক ডাকার শব্দ নয়, বুলকি বুঝতে পারল। তাহলে শব্দটা কিসের?

পায়ে পায়ে বুলকি বাইরে বেরিয়ে এল। এ বাড়ির বয়স কম হলো না। বংশানুক্রমে সবাই ব্যবহার করে গেছেন, কিন্তু সংস্কার করেননি। বিশাল বাড়িটা এখন যেন একটা ধ্বংসস্তূপ। নোনাধরা দেওয়ালে দাগড়া দাগড়া ঘা। চারপাশে আসশ্যাওড়ার জঙ্গল। মাত্র ক'টা ঘর সাফসুফো করে এখন ব্যবহার করা হয়। বুলকি দেখল, তারই একটা ঘরের সামনে একটা ছায়া দাঁড়িয়ে। ছায়াটার কাঁধে বিরাট একটা বোঝা। তবে, ছায়াটা যে ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো নয়, বুলকি বুঝতে পারল। আর, বুঝতে পেরেই ভূত-প্রেত না হয়ে যা হয়, তাই ভেবেই ছায়াটাকে পেছনে থেকে সজোরে

রামকৃষ্ণ সাহিত্য

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বঙ্গ নাট্য-সমাজের নেপথ্য কাহিনী

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রীশ্রীমা ও ডাকাত বাবা

তেলোভেলোর ভয়ঙ্কর মাঠে ডাকাত দম্পতির সামনে ঘটেছিল শ্রীমা সারদা দেবীর চিন্ময়ী রূপে আত্মপ্রকাশ, তারই কাহিনী।

শ্রীম কথিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
(অখণ্ড দিনানুক্রমিক সংস্করণ)

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলি আসলে বেদ ও উপনিষদের জীবন্ত ভাষ্য
- স্বামী বিবেকানন্দ

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রীশ্রীমা সারদা
(কালানুক্রমিক জীবনী ও কথামৃত)

সরল ও আবিমিশ্রভাব কেবল তাঁহার চরিত ও উক্তি।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক - এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।
- স্বামী বিবেকানন্দ

রবিদাস সাহারায়ের : ভগিনী নিবেদিতা
আমাদের মা সারদামণি
যুগাবতার রামকৃষ্ণ

Dr. Mamata Kundu's
A Critical Study of Universal Religion of Ramakrishna Paramahansa

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড,
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

জড়িয়ে বুলকি চিৎকার করে উঠল, চোর! চোর!

লোকটা খুব চালাক। বুলকি ভালোভাবে চিৎকার করার আগেই ওর মুখ চেপে ধরল চোরটা। লোকটার হাড়-জিরজিরে চেহারা। বয়েসও অনেক বেশি। ভাঙা মুখ। গুচ্ছের দাড়ি-গোঁফে মুখ প্রায় ঢাকা। চোরটা কাঁপতে কাঁপতে বলল, ছোটবাবু, চিৎকার করো না। দোহাই তোমার। কত্তাবাবু জেগে উঠলে, খড়ম পেটা করে আমার পিঠের ছাল-চামড়া সব ছাড়িয়ে নেবেন। আমি বিশে চোর ছোটবাবু!

শেষের দিকে বিশে চোর প্রায় কেঁদেই ফেলল। এই শরীরে মাংস নেই এক টুকরো। হাড়ের কাঠামোর উপর পোড়া বেগুনের খোলসের মতো চামড়াটা কেবল সম্বল। কত্তাবাবু যদি সেটাই ছাড়িয়ে নেয়, তবে! অথচ ছিঁচকে চোর হিসেবে বিশেকে সবাই চেনে। বুলকি দেখল, বিশে চোর নিজের ওজনের প্রায় দশগুণ মাল চুরি করে বস্তায় পুরেছে। রান্নাঘর থেকে পেতলের ঘটি-বাটি-কলসি-বাসন—এ বাড়ির শেষ বংশধরের যেটুকু সম্বল ছিল, তার প্রায় সবটাই লোপাট করেছে।

বুলকির মগজে সেই মুহূর্তে একটা বুদ্ধির গাছ গজিয়ে উঠল। ওর এখন একটা মামা দরকার। কাল ইস্কুলে মামাকে না নিয়ে গেলে, অঙ্ক স্যার ছড়ি মেরে ওর পিঠের চামড়া ছাড়াবে। তা, বিশে চোরের যা বয়েস, তাতে মামা হতে বাধা নেই। একটু সেজেগুজে সাফসুফো হয়ে গেলেই হলো।

বুলকি বলল, চিৎকার করবো না। চাই কি তোমাকে ছেড়েও দিতে পারি। তবে, যদি আমার একটা কাজ করে দাও।

কী কাজ ছোটবাবু? কান্না থামিয়ে বিশে চোর গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিল। বুলকি বলল, আমার ইস্কুলে তোমাকে কাল মামা সেজে যেতে হবে। পারবে তো?

মামা! বিশে চোরের মুখে-চোখে প্রগাঢ় বিস্ময়। তবে ও যখন চোর ছিল না, তখন ও শখের থিয়েটারে দু' একবার মামা-কাকা-জ্যাঠা সেজেছিল বটে, তবে সত্যি সত্যি মামা সাজার অভিজ্ঞতা ছিল না তার। কিন্তু বুলকি যে ভাবে চোখ পাকিয়ে বলল, বল, যাবে কিনা? নইলে আমি চেল্লাব কিন্তু। তখন বিশে চোর মামা না সেজে পারে কী করে! খানিকটা নিমরাজী হয়ে নিমতেতো গলায় বলল, তাই হবে ছোটবাবু। তোমার যা ইচ্ছে।

বুলকি তবু বলল, কাল আমি ইস্কুলের গেটে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। যদি না যাও, তবে তোমার বাড়ি থেকে তোমাকে আমি ধরে আনব। আমি কিন্তু তোমার বাড়ি-ঘর সব চিনি।

পরদিন ইস্কুলে গিয়ে বুলকি দেখল, বিশে চোর কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেনি। সেজে-গুজেই এসেছে। দাড়ি কামিয়ে, সাফসুফো জামাকাপড় পরে, রীতিমতো ভদ্রলোকের সাজ। কিন্তু অঙ্ক স্যারের চোখে ধুলো দেবার সাধ্য কার? অঙ্ক স্যার চশমার ভেতর দিয়ে দেখেই বললেন, আরে বিশে চোর না?

বিশে চোর নিজেও চিনতে পেরেছিল অঙ্ক স্যারকে। কে জানত, এই অঙ্ক স্যারই কানাই বাঁড়ুজ্যে! এই সেদিন তাঁর ঘরে সিঁধ কাটতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল সে। কানাই বাঁড়ুজ্যে তখন ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেননি বটে, তবে পিঠে এমন ঘা কতক দিয়েছিলেন যে, ব্যথাটা এখনো মাঝে মাঝে টনটন করে জ্বালা ধরায়। বিশে চোরের মুখ-চোখ কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল। এমন জলজ্যান্ত একটা বাঘের সামনে পড়লে কান্না তো আপনা থেকেই এসে যায়। বিশে চোর হাত জোড় করে, কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ঘাট হয়েছে স্যার। এমন অন্যায় জীবনে আর কোনোদিন করবো না। এই কান মুলছি, নাক মুলছি। দয়া করে এবারকার মতো ছেড়ে দেন।

অঙ্ক স্যার বিশে চোরকে ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু বুলকির জন্যে দপ্তরিকে ডেকে, একটা নয়, দুটো ছড়ির অর্ডার দিয়ে, দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, হতভাগা! আজ তোর একদিন কী আমার একদিন!

ছবি ঃ জুরান নাথ

জানো কী!

- *বন্ধুর মুখে একটি সাঁওতাল ছেলের প্রশংসা শুনে আদিনাথবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। বন্ধুর প্রশংসা তাঁর বুকে কাঁটার মতো বিঁধলো। কেন?*
- *কর্নেল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নরু ঠাকুরের দিকে। খুনের খবর দিয়ে গেল নরু ঠাকুর। নাঃ, তাঁর বরাতটাই এই রকম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাংলোর পথ ধরলেন তিনি।*
- *হীরা আর মোতির মধ্যে খুব ভাব। ঝুরী মালিকে তারা ভালোওবাসে খুব। কিন্তু বলদের বুদ্ধি তো.....হঠাৎ একদিন.....*
- *বুদুর কথা কেউ বিশ্বাস করে না। কেউ বলে ঢপ দিচ্ছিস, কেউ বলে.....বন্ধুদের নিলয় স্যারের কথা বলে কোনো লাভ হলো না। এবার সে কী করবে?*
- *প্রাণ খুলে গান গেয়েও কোনো লাভ হলো না। ঋষির কানে বোধহয় কিছুই ঢুকলো না। ধৈর্য হারিয়ে দুই বন্ধু ঋষিকে দিলো এক ঠেলা। আর সঙ্গে সঙ্গেই.....*

*এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার **ফাল্গুন** সংখ্যায়। সঙ্গে আরও অনেক কিছু যা তোমাদের চমকে দেবেই। হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুলরা তো আছেই।*

এইজন্যই যত সমস্যা

নীলেশ কুমার লায়েক

ক্যাওড়াতলার শ্যাওড়াগাছ। তার মগডালে ভূতের নাচ। থাকে গোটা পাঁচ। দোল খায়, গান গায়, চিৎকারে প্রাণ যায়। রাতবিরেতে বাজে ঢোল। দুপুররাতে খোলের বোল—ধিনিকিটি তিনি ধা। তালে তালে ভূত নাচে। দোল খায় গাছে গাছে। কেউ সারে গামা গায়, ছানা গাছে হামা দেয়। আর ফ্যা-ফ্যা হাসি, চ্যাঁ-চ্যাঁ কান্না। সব মিলিয়ে জমাটি রাত। হট্টরবে বাজিমাৎ।

জায়গাটা বড় নির্জন। লোকজন আসে না। যেখানে লোকের যাতায়াত সে জায়গা ভূতেরা ভালোবাসে না। তাই ক্যাওড়াতলার শ্যাওড়াগাছের মগডাল তাদের বড় পছন্দ। চারদিকে বেশ একটা ভয় ভয় গন্ধ। আকাশ দমবন্ধ। বাতাসে ভাসে ভুতুড়ে গানের ছন্দ—

সর্ষেতেলে লঙ্কা ভেজে
কয়লা দিয়ে দন্ত মেজে
আলতা মেখে এট্টু সেজে
করবো মোরা নেত্য।

দেখে জুড়িয়ে যাবে চেত্ত।

গানের সঙ্গে সঙ্গে কানে আসে কার পায়ের শব্দ। রাতের আঁধারে কে যেন চলেছে, ধীরে ধীরে, চুপিসাড়ে।

—কে যায়?

—পাঁচু যায়।

—কোন পাঁচু?

—চোর পাঁচু।

—কোথায়?

—আমার মাথায়।

ভূতেরা ভুতুড়ে ভাষায় কথা বলে। পাঁচু পথ চলে। রাতের কারবারী সে। রাতেই তার কাজকম্ম। দিনের বেলায় দানধম্ম। কাজের অভিজ্ঞতা আছে তার। আর আছে একটা সিঁদকাঠি। আছে মা চুরীশ্বরীর আশীর্বাদী চন্দনমাটি। এই নিয়েই সে চুরি করে, ঝুলি ভরে। পুঁতে দিয়ে আসে নদীর চরে। তারপর চুপিচুপি ফেরে ঘরে। হাওয়া ঠাণ্ডা হলে চোরাই মাল ঘরে তোলে। এসব কাজে তার পাকা হাত।

গভীর রাত। সবাই ঘুমোচ্ছে। পেঁচারাও গাছের ডালে ঝিমোচ্ছে। শুধু জেগে আছে পাঁচু। সে চলেছে সরকারবাড়ির দিকে। তাদের নাকি আছে টাকার গাছ। গুঁফো হাতাবে হাজার পাঁচ। তারপর চম্পট। পালিয়েই যাবে গাঁ ছেড়ে। নাহলে যদি পুলিশে ধরে!

রাত সাড়ে বারো। কিংবা বেশি আরো। পাঁচু পৌঁছাল সরকারবাড়ি। পাঁচিলের ওধারে পাতল আড়ি। বিহারী চৌকিদারের পাড়া জাগানো সাড়া ভেসে আসছে। সে এবাড়ির পাহারাদার। পাহারা দেওয়াই কাজ তার। কিন্তু তার খাটিয়া থেকে নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসছে অবিরাম। সুতরাং নো প্রবলেম। তাছাড়া পাঁচু মিত্তির ধরে যথেষ্ট এলেম। সিঁদ কাটে নিঃশব্দে। তাই আর দেরি না করে পাঁচিল টপকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল পাঁচু।

আরো মিনিট কুড়ি। চিল চেঁচাল এক

পাঁচু কই? এ তো আমাদের হ্যারিকেন।

খ্যানখেনে বুড়ি, কে র‍্যা! কে ওখানে? আর কে থাকে সেখানে! প্রাণ বগলে করে চোঁ-চাঁ দৌড় দিল পাঁচু। ভয়ে মুখ কাঁচুমাচু। ডানহাতে সিঁদকাঠি, বাঁহাতে পোঁটলায় চোরাই মাল। পাঁচুর হাল বেহাল। জেগে উঠেছে গোটা বাড়িটা। ধরতে পারলে তুলে নেবে ছাল। মাঝরাতে পাড়া কাঁপিয়ে চেঁচাল সবাই, চোর চোর।

শুনে কেটে গেল বিহারীর ঘুমের ঘোর। শুরু হলো তোড়জোড়। ডন টেনে, বৈঠক করে, লাঠিটাকে বাগিয়ে ধরে বিহারী দিল হাঁক, জয় রামজী কি-ই-ই.....আঁক।

পাঁচু আসছিল ছুটে। বিহারীকে দেখতে পায়নি মোটে। কাজেই সংঘাত। তাতেই কুপোকাত। কিন্তু হাজার হোক সে চৌকিদার। পাহারা দেওয়াই কাজ তার। তাই মুচ্ছো যেতে যেতেও আঁকড়ে ধরল পাঁচুর পুঁটুলি।

ওদিকে সবাই কাছে এসে গেছে। ধরলেই ভেঙে ফেলবে মাথার খুলি। সবাই চেঁচায়, মার মার। পাঁচু বলে, ছাড় ছাড়। বুড়ো বিহারী নির্বিকার। হতচ্ছাড়া পোঁটলাটা আঁকড়ে ধরেছে। ততক্ষণে পিঠেও দু-চার ঘা পড়েছে। সুতরাং আর দেরি নয়। হতে পারে প্রাণের সংশয়। 'জয় মা চুরীশ্বরী,' চোরদের দেবীকে স্মরণ করল পাঁচু। তারপর টান দিল পোঁটলায়। যদি শেষরক্ষা পায়, এই আশায়। সমস্তই বৃথা চেষ্টা। ধরাই পড়তে হবে শেষটা। তাই সে পোঁটলা ছাড়ল, সিঁদকাঠি ধরল। ঘোরাতে লাগল বনবন। এলোপাথাড়ি চালাল কিছুক্ষণ। তারপর সুযোগ বুঝে লম্বা।

দৌড় থামল নীলকুঠির মাঠে। ধপ করে বসে পড়ল ঘাসে। তাকিয়ে দেখল আশেপাশে। নাঃ, তারা আর তেড়ে আসছে না। বাঁচা গেল। কিন্তু এমন বাঁচার থেকে মরাই ভালো ছিল। চুরি করে ধরা পড়া, প্রাণ নিয়ে কেটে পড়া—চোরদের সমাজে আর মুখ দেখানোর জো রইল না।

পাঁচু অনেক ভাবল। ভাবল বসে বসে, আঁক কষে। হাত দিল গালে, ঘা দিল কপালে। উঠে দাঁড়াল। বসল মাঠের আলে। ভেবেই চলল রাতভর।

শেষে মনস্থির করে ফেলল সে। এই জীবনের আর দাম নেই। কাজেই বেঁচে থেকে কাম নেই। তার চেয়ে মরি। আত্মহত্যা করি। যেই ভাবা সেই কাজ। ঝটপট যোগাড় হয়ে গেল দড়ি। পাঁচু চেঁচাল, জয় মা চুরীশ্বরী। তারপর উঠে পড়ল গাছে। দড়িতে ফাঁস করল। সেটা গলায় পরল। রাখল একটু আলগা করে, যাতে গলায় টান না পড়ে। অপর প্রান্তটা ডালে বাঁধল। তারপর বেশ একটু কাঁদল—ভেউ ভেউ...ফেউ ফেউ...ঘেউ ঘেউ...

কাঁদছ কেন খোকা? আম নেবে?

ব্যস, থেমে গেল কাঁদুনি। কে কথা বলে? পাঁচুর বুক ঈষৎ টলে। কান খাড়া। খানিক পরে আবার এলো সাড়া, কি খোকা? আম খাবে নাকি?

নিকুচি করেছে তোর আম। তার চেয়ে বড় জীবনের দাম। তেঁনাদের হাতে মরার শখ নেই পাঁচুর। ভয়ে মুখ কাঁচুমাচু। তাই গলার ফাঁস খুলে ফেলে পাঁচু দিল লাফ। চোখেমুখে ভয়ের ছাপ।

পাঁচু ছুটছে। বুড়ো ভূত গাছের ডালে বসে রাগেই ফুটছে—অতিশয় ডেঁপো ছোকরা।

ততক্ষণে পাঁচু পৌঁছেছে নদীর তীরে। খুব আনন্দ তার বেঁচে ফিরে। নদীর নাম পুষ্করিণী। জলে চরে জলহরিণী। কাচের মতো জল। স্বচ্ছ-টলটল। চোখে মুখে জলের ঝাপটা নিল পাঁচু। তারপর নদীর বালিতেই লম্বা ঘুম।

ঘোষবাড়িতে একেবারে হুলস্থূল পড়ে গেল।

কি ব্যাপার মাসিমা, কি হলো?

আর কি হলো! হ্যারিকেনটা কি কোনোদিন মানুষ হবে না র‍্যা?

হ্যারিকেনটি আবার কে?

কে আবার! আমাদের গরুটা রে ছোঁড়া। পুঁটিকে গুঁতো মেরেছে।

তবেই সেরেছে। আপনি কিছু ভাববেন না। দুঃখু করে থাকবেন না। হতচ্ছাড়ার শিং আমরা মটকে দেব। সে কোথায়?

আমার মাথায়।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ। আর কি সে থাকে মরতে?

আমরা আছি কি করতে? চিন্তা নেই, আমরাই হ্যারিকেনকে খুঁজে দেব।

তোদের মাথা কেটে নেব। অমন কাজ করেছিস, কি মরেছিস। খবরদার। ও খুনের মুখই দেখব না আর।

ছেলেছোকরারা অতঃপর কেটে পড়ল।

কিন্তু একটা ভাবনা ছেঁকে ধরল। গরু কি করে পালিয়ে গেল? দড়ি তো বাঁধাই ছিল। দড়ি কি কম্মুর? উবে গেল ভুরভুর? অ্যাঁ? দড়ি খুলল কে?

হ্যারিকেনের এখন অনাবিল আনন্দ। কাল রাত্তিরে ঘুমোচ্ছিল সে গোয়ালে। হঠাৎ আওয়াজ শুনল দেওয়ালে। কেটে গেল কাঁচা ঘুম। ব্যাপার দেখে আক্কেল গুম। দেওয়ালের গায়ে বিশাল হাঁ। তার পাশে একটা মানুষ। এগিয়ে এল ঝটাপট। খুলে ফেলল পটাপট। হ্যারিকেনের গলার দড়ি ভাঁজ করে হাঁটা দিল গটাগট। কেটে পড়ল ফুটোপথে। মানুষ নয় লোকটা মোটে। নির্ঘাৎ দেবতা।

রাত যায়, পাখি গায়, জেগে ওঠে পৃথিবী। জেগে উঠল বাড়ির লোকজন। গোয়ালের দোর খুলতে এলো পুঁটি। প্রচণ্ড হিংসুটি। সুযোগ পেলেই লাঠি দিয়ে, কাঠি দিয়ে হ্যারিকেনকে পেটায়। এমন সুযোগ ক'জন পায়—ভাবল হ্যারিকেন। প্রথমেই দিল শিঙের গুঁতো, তারপর দিল ছুট।

যেতে যেতে চোখে পড়ল ঘেঁটুশাকের বাগান। ঐটেই বছিরুদ্দিনের প্রাণ। হ্যারিকেন ঢুকে পড়ল সেখানে। বছিরুদ্দিনের প্রাণ চিবিয়ে খেল। পেট বুঝি ভরে গেল। ভরাগলায় গান ধরল সে।

বছিরুদ্দিন এল তেড়ে। হাতে টাঙি। কানে গেছে হ্যারিকেনের গান। বরবাদ হয়েছে সাধের বাগান। ধরতে পারলে কেটে নেবে কান। আর কি কেউ থাকে সেখানে?

ধর ধর। ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দে।

কাকে?

ঐ যে—ঐ ঘোষেদের—

পুঁটি?

না না, ওদের গরু হ্যারিকেন।

কোথায় সে? কোন মুলুকে?

পালিয়ে গেল নদীর দিকে।

নদীর নাম পুষ্করিণী। হ্যারিকেন ছুটেছে সেদিকে। ছুটেছে হেলেদুলে, এঁকেবেঁকে। পথে পড়ল আমগাছ। ডাল থেকে ঝুলন্ত ফাঁস। তাতেই সে আটকা পড়ল। অমনি বুড়োভূত চেপে ধরল, কোথায় গিয়েছিলে খোকা? তোমার জন্য এই এত আম পেড়ে রেখেছি।

সমস্যার নেই অন্ত। ব্যাপার গড়াল থানা পর্যন্ত।

ঘোষেরা পাঁচুর নামে নালিশ করেছে। দোষ—গরুর দড়ি চুরি। প্রমাণ আছে ভূরি ভূরি। সিঁদ কেটেছে দেওয়ালে। নিরেট ফুটো গোয়ালে। পাঁচু ছাড়া আর কে পারে এ কাজ?

বছিরুদ্দিনের রণং দেহি সাজ। হাত-পা ছুঁড়ে বলে, আমার বাগান গেল জলে। সব শাক মুড়িয়ে খেয়েছে ওদের হ্যারিকেন।

দারোগা লোকটি অতিকায়। মজে ছিলেন দিবানিদ্রায়। হুকুম দিলেন নেহাতই অনিচ্ছায়, ধরে আন হতচ্ছাড়াদের।

কিন্তু কোথায় তারা??

দুই হাবিলদারের একজন জানাল, পাঁচুকে দেখেছি কাল রাতে। হাওয়া খেতে উঠেছিলাম ছাতে। সে ছিল নীলকুঠির মাঠে। দেখে মনে হলো দুঃখে আছে। হাতে দড়ি নিয়ে উঠল গাছে। লাগল দেখে বীভৎস ভয়। আত্মহত্যার চেষ্টা বোধহয়।

তারপর?

আর জানি না। আর দেখিনি ভয়ে। কিন্তু হ্যারিকেন কোন মুলুকে?

সে গেছে নদীর দিকে—জানাল বছিরুদ্দিন, নদীর নাম পুষ্করিণী। জানি আমি বিলক্ষণই।

দুই হাবিলদার ছুটল দু' জায়গায়।

থানা জুড়ে উৎকণ্ঠা। কেটে গেল দু-চার ঘণ্টা। ছটফটিয়ে উঠল মনটা। এমন সময় ফিরল প্রথম হাবিলদার।

পাঁচুকে নিয়ে এসেছি স্যার।

কোথায় সে?

নীলকুঠির মাঠে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছিল। আসতে চাইছিল না কিছুতেই।

এখন কোথায় সেই উজবুক?

বাইরে স্যার, গাছের তলায় বাঁধা থাকুক।

গাছের গোড়ায় একটা চতুষ্পদ বাঁধা। ঘোষেরা দেখে বললে, উরে দাদা, পাঁচু কই? এ তো আমাদের হ্যারিকেন।

ফিরে এল দ্বিতীয় হাবিলদার।

হ্যারিকেনকে ধরে এনেছি স্যার।

কোথায় সে?

নদীর তীরে, বেড়াচ্ছিল চরে। নিয়ে এলাম ধরে।

এখন সেই উজবুকটা কোথায়?

আপনার সামনে স্যার, এই হেথায়।

একটা দ্বিপদকে দেখে বছির বলে, ফালতু না বকবেন। কোথায় হ্যারিকেন? এ তো হতচ্ছাড়া পাঁচু।

দারোগার মুখ কাঁচুমাচু।

ছবি ঃ সৃদীপ্ত মণ্ডল

ধূমপান সমাচার

পৃথিবীতে ধূমপানের ফলে মারা যান ৪০ লক্ষ লোক। আগামী ৩০ বছরে এই সংখ্যা কোটিতে পৌঁছে যাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংখ্যার সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কিশোর ধূমপায়ীর সংখ্যা বাড়ছে। ১৩-১৫ বয়সী প্রতি ৫ জন স্কুল ছাত্রের একজন ধূমপান করে। এদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন তাদের ১০ বছর বয়স হবার আগেই এই নেশাটা ধরেছে।

উন্নত দেশগুলিতে আইন অথবা জনসচেতনা বৃদ্ধির সাহায্যে ধূমপান যথেষ্ট কমানো সম্ভব হয়েছে। এখন তামাক কোম্পানিগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তাদের মূল বাজার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মজার পাতা

নতুন শব্দমালা

সূত্র :

পাশাপাশি :

১. সীতার মতো নারী
২. এক শ্রেণীর মনসা গাছ
৬. চাল-গম ভরতে লাগে
৭. এতে ঠেস দিয়ে বসে
৯. তেলেভাজা এইরকমই ভালো
১১. তিনের গুণিতকের পূরণবাচক
১৪. ভীষণ ভীতু প্রাণী
১৬. আরবী ভাষায় ঈশ্বরের কথা
১৯. পদার্থের একটি অবস্থা
২০. খাট, টেবিল যার ওপর দাঁড়িয়ে
২১. চেপে রাখা
২২. নতুন যুগ

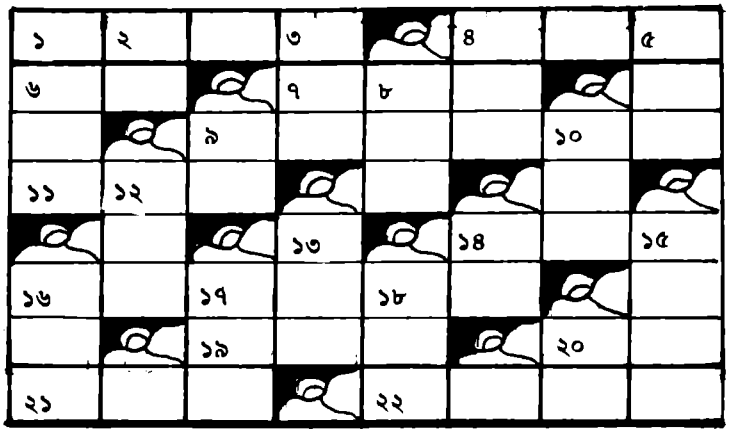

এটি তৈরি করেছেন বাবলু কাজী, ছত্রিশগড়, বর্ধমান।

উপর-নিচ :

১. বায়ু
২. উত্তরবঙ্গের নদী
৩. মধ্য এশিয়ার জাতি
৪. কবিতায় ত্যাগ
৫. ঘড়ি বলে
৮. কি প্রকারে
৯. খাদ্যশস্য বিশেষ
১০. রমাপতি, নারায়ণ
১২. প্রতিশোধ
১৩. চাকরিই এর কাম্য
১৪. মনঃসংযম
১৫. তারাশঙ্করের উপন্যাসে পাবে একে
১৬. গলগ্রহকে এই বলে কটূক্তি করে
১৭. অনুরূপ
১৮. এক যে ছিল ফকির
২০. ঝানু বা অভিজ্ঞ

এ মাসের প্রশ্ন

মানবকোষের একটি অন্যতম এবং বিস্ময়কর অঙ্গাণু হল 'ডি.এন.এ' ডি.এন.এ কথাটা তোমরা নিশ্চয় শুনে থাকবে, কিন্তু বলতে পারো, ডি.এন.এ-র পুরো নাম কি?

পাশের ছবিটি সেই বিজ্ঞানীর যিনি তাঁর সহগবেষক ক্রিককে সঙ্গে নিয়ে ডি.এন.এ-র মডেল আবিষ্কার করেন, এই বিজ্ঞানীর নাম কি?

মজার পাতা

নতুন ধাঁধা

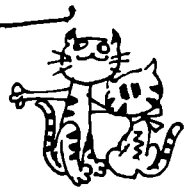

১. নিতে বলছি নিয়ে যা
পরে কিন্তু নিবি তা,
শেষে শোনো মহাশয়
ভাল তাঁকে সবাই কয়।

শংকর দাশ
লোকপুর/বাঁকুড়া

২. সংখ্যার মধ্যে জলাশয়
শীতের সঙ্গী অঙ্গে রয়।

দেবিদাস ব্যানার্জী
দিগপাড়/বাঁকুড়া

৩. পদবী এল মস্তকে জল নিয়ে
অদৃষ্ট সবাই দেখবে পরখ করে।

বিভা সাহা
বিজয়গড়/কলকাতা

৪. মানুষের মাঝে বিশেষ আধার
অভিনয়ে সেরা জানা সবাকার।

প্রলয় বাগচী
কল্যাণপুর/আসানসোল

বিকির মজার অঙ্ক

■ দু'অঙ্কের একটি সংখ্যা ; অঙ্কদুটি যোগ করে যোগফলের 'ছয়' গুন অথবা ঐ সংখ্যার সাথে 'নয়' যোগ করলে অঙ্কদুটির স্থান উল্টে যায়। এমন তবে বলতো সংখ্যাটি কত?

■■ মোমকে তার দাদু দিদার বয়স জিজ্ঞাসা করায় সে বলে— 'দাদুর বয়স দিদার বয়সের ঠিক উল্টো, কিন্তু বেশী'। আবার দু'জনের বয়সের পার্থক্য (difference) হল দু'জনের বয়সের যোগফলের ১১ ভাগের ১ ভাগ। তুমি কি বলতে পারো মোমের দাদু আর দিদার সঠিক বয়স কত?

ফুটকি থেকে ফুটকি

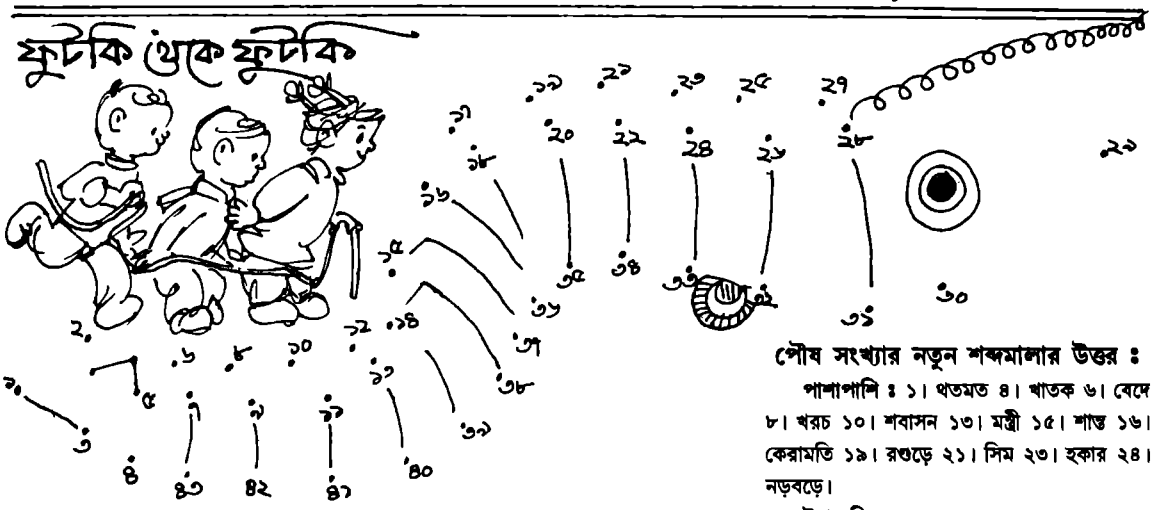

পৌষ সংখ্যার নতুন শব্দমালার উত্তর :

পাশাপাশি : ১। থতমত ৪। খাতক ৬। বেদে ৮। খরচ ১০। শবাসন ১৩। মন্ত্রী ১৫। শান্ত ১৬। কেরামতি ১৯। রগুড়ে ২১। সিম ২৩। হুকার ২৪। নড়বড়ে।

উপর-নিচ : ২। তস্কর ৩। তবে ৫। তরাস ৭। দেশ ৯। চমচম ১১। বারান্তর ১২। নদী ১৪। শিকে ১৭। রাধিকা ১৮। তিসি ২০। গুজব ২২। মন।

পৌষ সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তর :

১. বক ২. নীরব ৩. বিনাশ ৪. বাজেট

আশ্বিন সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম ঃ

।। **কলকাতা** ।।

সৌরভ, সৌনক, অর্ণব, অলকা, শঙ্কর, রূপা, কৃষ্ণা ও ভাইলু/অণুশক্তি আবাসন, কল-৬৪; দ্বীপায়ন, সুস্মিতা, গৌতম সেন, বিশু গুপ্ত/সাউথ এন্ড পার্ক, কল-২৯; তাপস, রত্না, অভয়, পূবালী ও সৌভিক/আটল বিহারী বসু লেন, কল-১১; রিয়া, রূপ, মিতালি, অমিত, টুকাই, আল্পা, পাল্পা, টুপা ও মনুয়া/সল্টলেক, কল-৬৪; নিতু ও স্বপ্না চ্যাটার্জী, ফুচু ও বাবুসোনা/গোপাললাল ঠাকুর রোড, কল-৩৬; কাজন্তি সরকার, প্রলয় ও প্রসূন ভট্টাচার্য, অনিমা মুখার্জী/কালীতলা, বাগুইআটি, কল-৫৯; বুলবুলি, খুতু, বীপুন ও নন্দিতা/রিজেন্ট এস্টেট, কল-৯২; জিৎ, মুনিয়া, বাবলু ও জয়/হিন্দুস্তান পার্ক কল-২৯; লক্ষ্মীশ্রী, শিবব্রত, রাঙারানী ও নির্মল কুমার লাহি/যশোর রোড, লেকটাউন, কল-৮৯; ধ্রুব, সংযুক্ত ও মা/ শাঁখারী পাড়া রোড, কল-২৫; অমিত আগরওয়াল ও প্রতিমা ঘোষ/বসন্তলাল সাহা রোড (কলাবাগান) কল-৫৩;

।। **২৪ পরগনা (উঃ/দঃ)** ।।

অর্ঘ্য ও মলয়/গোবরডাঙা, জৈপুর (উঃ); সৌম, শমিত, শরণ্যা ও সায়ন বটব্যাল/দক্ষিণ বারাসাত (দঃ); অতীন ও মৌসুমী গুহঠাকুরতা/দক্ষিণ মাসুন্দা, নববারাকপুর (উঃ); বর্ণালী পুততুন্ড/চণ্ডীগড়, মধ্যমগ্রাম (উঃ); সমীরণ রায়/গোবরডাঙা রেল কোয়ার্টার, ঘাঁটুরা (উঃ); তুষার, সৌমিতা, সায়ক, লাভলী চক্রবর্তী/হরিনাভি (দঃ); শ্রীময়ী ভট্টাচার্য/রহড়া (উঃ);

।। **হাওড়া** ।।

মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও শতাব্দী মুখার্জী/গণেশ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর; মালবিকা হাজরা/নারিট, আমতা; জয়তী, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রনীল ও তুহিন কুমার গুপ্ত/নবকুমার নন্দী লেন; সৌম, সৌরভ ও সোনালি ব্যানার্জী/বি. বি. হালদার লেন, শিবপুর; বুধা ও ডোরা মুখার্জী/বিনোদ বিহারী লেন, শিবপুর; প্রদীপ ও অপর্ণা বসু/মধুসূদন বিশ্বাস লেন; অরুণাভ ও অরিন্দম ঘোষ/সদরবক্সি লেন;

।। **হুগলী** ।।

মোনালিসা লাহিড়ী ও শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী/এস. জে. কে. স্ট্রিট, উত্তরপাড়া; দেবাশিস, স্নেহাশিস ও দিয়া চট্টোপাধ্যায়, রিয়া, রাজা, শুভো ও রায়া বন্দ্যোপাধ্যায়/এল. এম. ভট্টাচার্য স্ট্রিট, শ্রীরামপুর; সায়ন, স্বাতী, অপর্ণা, অরিন্দম, সুকুমার, বিজয়, বলরাম, মামনি, চিত্রা ও রমা/জমিদার রোড, শেওড়াফুলী; তিস্তা ও রীতা সরকার/নবপল্লী ও শেওড়াফুলী; শুভঙ্কর ও কেশব ঘোষ/ভোঁপুর; বাচ্চু, টুলু ও রুদ্র ঘোষ/লেকপাড়া, আরামবাগ; অচিন্ত্য, প্রশান্ত ও জয়ন্ত ঘোষ/ইন্দিরা পল্লী, আরামবাগ;

।। **বর্ধমান** ।।

অভীক ও অন্তরা বাউরী/শান্তিপথ, সি. জোন, দুর্গাপুর; পরেশ চন্দ্র পাল, তারক মুখার্জী ও সঞ্জয় মণ্ডল/তিরাট মিলন মন্দির লাইব্রেরি; জহর, দীপ্তি, মিলি ও মাম নায়ক/হিলভিউ ইস্ট, আসানসোল; সোহিনী ও সৌভিক ঘোষ/স্কুলপাড়া, রানীগঞ্জ; বুয়া, রুবাই, টুয়া ও টুবাই/মানকর, পূর্বাশা; সৌনক ও সঞ্জীব কুমার/অমরারগড়; বাসবী, শতভিষা, যশোধারা ও ডাঃ উত্তমকুমার বটব্যাল/আলডি অফিসার্স কোয়ার্টার, আলডি; দ্রিয়া, রুম্পা, শিল্পী, বেবি, বিল্টু, বুবু ও সিজার/শাঁকতোড়িয়া; তপন, রীনা ও ঋতুপর্ণা মুখার্জী/শাঁকতোড়িয়া; পীযূষ, জয়শ্রী ও প্রলয় বাগচী/কল্যাণপুর হাউসিং কলোনি, আসানসোল; মিষ্টি, কুম, টিনি, তিতির, বাপ্টু, মান্তা ও ডাঃ উত্তমকুমার বটব্যাল/উধী আর্যাবর্ত, দুর্গাপুর; অভিষেক, মালিনী, পৌলমী ও শ্যামাদাস ব্যানার্জী/ইভলিন লজ, আসানসোল; প্রণব, গীতা, সৌম্য সেনগুপ্ত ও চিত্রলেখা দাশগুপ্ত/বহালপাড়া, কুলটি; টোটো, টুবাই, টনি ও দুলাল কাকা/বাংকোলা এরিয়া কলোনি, উখড়া;

।। **বীরভূম** ।।

বাপি, টুবান, পিকু, গুড্ডু, গোগোল ও জিকো/আমেদপুর; ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, অর্ক, যিশু, নেহা মণ্ডল, শুভম ও তাতাই মুখার্জী/আমেদপুর; তপন, নিনু, মাধুরী-নিনি, পার্থ, প্রণব, চন্দন, মামণি, মাম্পি, সায়ন দেব, অয়ন, সঙ্কিতা, প্রিয়াঙ্কা, ডোনা দে ও প্রদীপ ব্যানার্জী/সাঁইথিয়া, লাউতোড়; লাল, মামণি, সোমনাথ ও মিনু/স্কুলবাগান, বোলপুর;

।। **বাঁকুড়া** ।।

অভি মুখোপাধ্যায়/পার্বতীপুর রেলপাড় কলোনি, মেজিয়া; শিলু, মিলু ও তিলু/ভক্তাবাঁধ; অনিন্দিতা, প্রেমসুন্দর ও প্রীতিসুন্দর বটব্যাল/ভক্তাবাঁধ; শ্রাবন্তী, হৈমন্তী, অর্ণব, দীপা ও বিশ্বদেব বটব্যাল/ ভক্তাবাঁধ; সঙ্কিতা, অন্বেষা ও সুব্রত লায়েক/মটুকবনী; ডাঃ রামপ্রসাদ ধঁক ও দেবিদাস ব্যানার্জী/চাতরার মোড়, দাসদীঘি; ডলি, বকুল, মুকুল ও দেবিদাস ব্যানার্জী/দিগপাড়; জয়দীপ রায়/উখড়াডিহি; কল্যাণ ও জয়শ্রী শাখা/রাম সাগর; দেবিদাস, জেবতনু, পুতুল ও তৃণা ব্যানার্জী/দিগপাড়; শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু, সৌরাংশু ও স্নেহাংশু/মটুকবনী; সাম্যজিৎ, দূর্বা ও জহর বসু/কোয়ার্টার ডি. এস., দঃ পূর্ব রেল; তনুশ্রী ও শ্রেয়সী ব্যানার্জী/জুনবেদিয়া; সুভদ্রা ও শিউলি নায়ক/গঙ্গাজলঘাটী; অশোক, লাবণ্য, পায়েল ও অয়ন দাস/দোলতলা; বলু, লাবু, মুন্নি ও পাপুন/নাজিরবান্দপাড়; নিসর্গ, রেখা ও কাঞ্চন কুমার দাস/ কলেজ পাড়া, বেলিয়াতোড়; বিকাশ, মালা ও সবিতা দাস/ওল্ড মিশন স্কুল রোড; অশোক/কুচকুচিয়া; পাপুন ও বুবাই/মোলডুবকা; অনির্বাণ পাত্র/হাতিরামপুর; ইন্দ্রনীল রায়/মেজিয়া হাইস্কুল ডাঙা, মেজিয়া;

।। **মেদিনীপুর** ।।

অনিন্দিতা ও অপরাজিতা পাল/আনন্দপুর; শিবানী, সর্বাণী, শ্রাবণী, সংকর্ষণ ও সঞ্জীব চন্দ্র পানিগ্রাহী দেখালী বর্মাকান্তি, সমীরকান্তি, শ্যামশ্রী, শুকশ্রী, সৌমাকান্তি ও শুভ্রকান্তি ত্রিপাঠী/সাঁয়াপাড়া, বেলদা; সমু, বাপ্পা, মলি, রমু ও সিধু/মুগবেড়িয়া; সৌমিতা, সোহন, তৃপ্তি ও বিশ্বজিৎ কর/সুভাষ পল্লী, খড়গপুর; সুশোভন জানা ও ভাইয়া/কুলটিকরী, নিবেদিতা, সংগীতা, সুমন ও শিবানন্দ বেরা/মেনকাপুর; কৌস্তভ ও কল্লোল দাস, নন্দ হেমব্রম/শালিকোঠা; লিজ্যা, লিশা, পলি, পাপু, শ্রীধর, শিবানী, সৌরভ, পৌলমী, শ্রাবণী, তনুশ্রী, প্রণীতা, নিবেদিতা, সুমিতা, বুল্টি, রিংকি, টুকটুক, আগমনী, ছবি, তুলসী, পিকু, তুতু, লীনা, পলাশ, রনি, আর্য ও কাজলাগড়; এম. এস. বি. সি. এম. এইচ. হাইস্কুলের সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ/কাজলাগড়; প্রতিম, সংহিতা ও সুপর্ণা চট্টরাজ/আই. আই. টি. খড়গপুর; শ্রীলেখা, মনিকা, সুপ্তি, স্বর্ণেন্দু, দীপ্তি ও নিমাই নায়ক/গড়বেতা; অনিন্দিতা, অরিন্দম ও অমৃতা গিরি/বাসুদেবপুর, অমর্ষি; অলক, বলাই, পিন্টু, পীযূষ ও মধু শামল/শোনপুর, রামনগর;

।। **মুর্শিদাবাদ** ।।

অরুণ, সঙ্গীতা, দেবদ্যুতি ও দূর্বাদল দাস/এ. সি. রোড (পূর্ব), খাগড়া; দেবাংশু, চৈতালী, শিল্পী, প্রতিমা, গৌরব, দেবাশি ও কৃষ্ণ/গোরাবাজার, বহরমপুর; পিউ গুপ্ত/অরবিন্দ পল্লী, রঘুনাথগঞ্জ; শুভঙ্কর ও তন্দ্রা চক্রবর্তী/তমালতলা, আজিমগঞ্জ; ফেরদৌসী খানম, জেবুন্নেসা খানম ও নজুলা খানম/বাণীনাথপুর (আশ্রম) সারগাজি আশ্রম; মোঃ সফিকুল ইসলাম, মোঃ রফিকুল ইসলাম ও শিরীন সুলতানা/চর-কাবিলপুর, সাগরদীঘি; গোপাল বিশ্বাস, মানসী, সকুল ও সুমনা কর্মকার/গোয়ালজান, বহরমপুর;

।। **পুরুলিয়া** ।।

দীপক, সৌমেন, রিয়া ও প্রিয়া চৌবে/আনাড়াগ্রাম; দিলীপ, অমর, সজল, তাপস, সঞ্জয়, রামদুলাল, সলিল, বিশ্বজিৎ ও দীপু/আনাড়াগ্রাম;

।। **নদীয়া** ।।

কুমার শঙ্কর/শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর; বাঁধন, সোনিয়া ও খন্দকার আব্দুল মোমেন/কৃষ্ণগঞ্জ; মুকুল, চামেলি, বিপ্লব, শ্যামলী, মৌসুমী, ব্রতীন ও পৌলমী ব্যানার্জী/শিমুরালী;

।। **জলপাইগুড়ি** ।।

সমর ও বুলা দে/ইঞ্জিনিয়ারিং কলোনি, আলিপুরদুয়ার জংশন;

।। **দক্ষিণ দিনাজপুর** ।।

সুকান্ত অধিকারী, চিরদীপ অধিকারী, গোবর্ধন চন্দ্র দাস, ধর্মরাজ মণ্ডল ও মারুতি রায়/হরিরামপুর;

।। **দার্জিলিং** ।।

পরিমল, শিবানী, মুনাদিদি, ঋজু ও ঋক/মিলন পল্লী, সরকারী আবাসন, শিলিগুড়ি;

।। **ঝাড়খণ্ড** ।।

নিরঞ্জন, রুবেন, শুভেন, বুবুন, চুমকি ও রিচিক করগুপ্ত/জামশেদপুর;

।। **মহারাষ্ট্র** ।।

সুপর্ণকান্তি দাশ/ভি. আর. সি. ই. হোস্টেল, নাগপুর;

।। **কর্ণাটক** ।।

রীতম ভট্টাচার্য/ব্যাঙ্গালোর;

।। **অসম** ।।

রেশমী, গীতা ও উদয় ভট্টাচার্য/লামডিং; দীলু, রাজু ও রুমী দত্ত/রেস্ট ক্যাম্প, গুয়াহাটি; অরুণ, কুমার টুডু/বড়ঠাকুর মিল রোড, পূবালী হাউসিং কো-অপ সোসাইটি, উলুবাড়ি, গুয়াহাটি; পিউ, চয়ন, রত্না ও দেবরূপা দত্তরায়/পূবালী এপার্টমেন্ট, বড়ঠাকুর মিল রোড, গুয়াহাটি।

রাজযোটক

শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

একদা এক ঘটকমশাই বনের ভিতর দিয়ে
যাচ্ছিল তার কাজে, হাতে চটের থলি নিয়ে।
থলিটা বেশ মস্ত ছিল, সঙ্গে ছিল রশি,
মাথার 'পরে আকাশটাতে ছিল পূর্ণশশী।
পথের মাঝে হঠাৎ হলো বাঘের সাথে দেখা,
"হালুম" করে বললে হেসে, "চললে কোথায় একা?
পেটে আমার দারুণ খিদে তোমায় খাবো মেরে,"
থরথরিয়ে ঘটক বলে, "আমায় দে ভাই ছেড়ে!
আমি হলাম গরিব বামুন, পেশা যে 'ঘটকালি';
কেমন করে সে কাজ করি ঘাড় যদি মটকালি!"
তাই না শুনে বাঘ তো অবাক! শুধায়, "ঠাকুর, সে কি!
'ঘটকালি' কি জিনিস এবার আমায় বলো দেখি?"
"সে এক মজার জিনিস বটে!" উত্তর দেয় ঘটক,
"একজনকে দুজন করি—ঠিক যেন রাজযোটক।"
বনের রাজার ইচ্ছে তখন সেও দুজন হবে;
ঘটক বলে, "বেশ তো ভায়া, থলেয় ঢোক তবে।"
যেই না থলের মধ্যে ঢোকা অমনি রশির বাঁধন,
তার ওপরে বেশটি করে পড়লো লাঠির গাদন।
বাড়ির পরে বাড়ি খেয়ে বাঘ হলো প্রায় কাবু;
নদীর জলে ফেললে তাকে চালাক ঘটকবাবু।
থলিটি যায় অপর পারে নদীর স্রোতে ভেসে;
ঘটক পালায় প্রাণটি নিয়ে ঘটকীর উদ্দেশে।
অবশেষে অপর পারে ঠেকলো থলি যখন;
এক বাঘিনী তেষ্টা নিয়ে সেথায় এলো তখন।
নাক দিয়ে সে খানিক শুঁকে, জিভ দিয়ে সে চেটে,
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লো থলি—বাঁধন গেল কেটে।
বাইরে এসে মুখোমুখি দুজন দুজনারই—
বাঘিনীকে দেখেই বাঘের মনটি খুশি ভারি।
ভাবলে, ঘটক ঠিক বলেছে, একটুও নেই ভুল;
একা ছিলাম, দোকা হলাম, ফুটলো বিয়ের ফুল।
তারপরে সে বিবৃতি দেয় ঘটলো যা সম্প্রতি,
সেদিন থেকে বাঘ-বাঘিনী এক সুখী দম্পতি।।

(সাঁওতালী রূপকথা অবলম্বনে)

বইমেলাতে খোকন

সায়ন্তনী পাল

বইমেলাতে কিনলো খোকন
অনেক—অনেক বই।
বললো দাদা, খোকন, আমার
থ্রিলার, কমিক্স্ কই?
মা জননী চোখ পাকালেন,
অতগুলো টাকা
দিলুম বলেই বইমেলাতে
সব করেছিস ফাঁকা!
ঠাম্মা এলেন ফোকলা দাঁতে
"দাদু, আমার গীতা?"
খোকন বলে, ভুলেই গেছি
তোমার গীতার কথা।
ছোট্ট তুতুল বোনটি এলো
চোখ জলে থইথই
হাত, পা ছুঁড়ে বললো,
ছড়ার বইটা আমার কই?

মজার খেলা জাগলিং

অভয় মিত্র

খোকনসোনা খুকুনমণি
দেখবি যদি চল
চাচার হাতে কেমন করে
ঘুরছে ছটা বল
রঙিন টুপি হাওয়ায় ভেসে
আসছেরে দ্যাখ উড়ে
বসছে শেষে মাথার প'রে
বৃত্তাকারে ঘুরে
লাঠির ডগায় ব্যালেন্স করে
লাল সাদা ওই ডিশ
একটা দুটো নয়রে খোকা
হবে উনিশ বিশ
চাচাবাবুর সবই খেলা
হাতের কেরামতি
দেখার পরে হাততালি দেয়
দাদুর সাথে নাতি।

ছবি: সুফি

ফটিকের ফুল নম্বর রহস্য

সুদর্শন নন্দী

অবাক কাণ্ড! ফটিক হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় ইংরেজি আর অঙ্কে পেয়েছে ফুল নম্বর। অবাক সব ছাত্ররা, অবাক আমাদের পিওন থেকে হেডমাস্টারমশায়। যে ছেলে অঙ্কে যোগের জায়গায় বিয়োগ, গুণের জায়গায় ভাগ করে, ইংরাজীতে বিড়াল মাছ খায় ট্রান্সলেশন লিখতে দিলে অনেক কষ্ট করে মাছের মুখে বেড়াল ঢুকিয়ে দেয়, সেই ফটিকচন্দ্র যদি এসব বিষয়ে ফুল মার্কস পায় তবে অবাক হবারই কথা।

হেডমাস্টারমশায় ফটিকের উপর যত না রাগলেন তার থেকে বেশি রাগলেন ইংরাজী আর অঙ্ক মাস্টারমশায়দের উপর। ডেকে দুই মাস্টারমশায়কে বেশ কড়া মেজাজে ধমকালেন, টিউশনি-ফিউশনি করা এবার বন্ধ করুন, কী জবাব দেব বলুন দেখি অন্য গার্জেনদের?

দুজনেই প্রায় সমস্বরে মাথা নিচু করে বললেন, স্যার ভুল বুঝছেন, ফটিক আমাদের কাছে পড়ে না। তাছাড়া এ ধরনের কাজ আমরা করতে পারি তা বিশ্বাস করতেও সবাই লজ্জা পাবে।

একটা গবেট ছেলে সে পেল ফুল নম্বর, এর মধ্যে কোনো রহস্য নেই ভেবেছেন? আজ সময় দিলাম। তদন্ত করে কাল রিপোর্ট দেবেন। হেডমাস্টারমশায় কড়া নির্দেশ দিলেন।

ইংরাজীর মাস্টারমশায় দীনেশবাবু অঙ্কের মাস্টারমশায় রবিবাবুকে নিয়ে বাইরে এলেন। রবিবাবু বললেন, কী করে হলো বল দেখি এটা?

দীনেশবাবু বললেন, আচ্ছা এমনও তো হতে পারে ও পড়াশুনায় বেশি মনোযোগ দিয়েছে, খেটেছে, তাই ফুল মার্কস পেয়েছে।

কী বলছ দীনেশ। পরীক্ষার পর থেকে এই খাতা বেরোবার আগে পর্যন্ত ক্লাসে ওর পড়াশুনার হাল দেখে মনে হয়েছে ওর সীটে একটা গাধা বসলেও বোধহয় মানুষ হয়ে যেত।

শুনে দীনেশবাবু বললেন, তবে?

তবে একবার ফটিককে ডাকলে হতো না? রবিবাবু যুক্তি দিলেন।

যুক্তিমতো ডাকা হলো ফটিককে। ফটিক এল। গোবেচারীর মতন মাথা নিচু করে লজ্জা মেশানো গলায় শুধাল, আমাকে ডেকেছেন স্যার?

রবিবাবু বললেন, হ্যাঁ ফটিক। তুমি তো এবার অঙ্ক আর ইংরাজীতে ফুল নম্বর পেয়েছো। আমরা খুব খুশি হয়েছি। তা কীভাবে তুমি পড়াশুনা করেছ আমাদের একটু খুলে বলো তো।

ফটিক যেন আরো মাটিতে মিশে যায়। মাথা চুলকে বলে, প্রতিদিনই রাত একটা পর্যন্ত পুরো বই অঙ্ক কষতাম, ইংরেজি মুখস্থ করতাম। সবই তাই লিখতে পেরেছি। অ্যানুয়ালে ভূগোল, ইতিহাসে জোর দেব ভাবছি।

ফটিকের হাবেভাবে মাস্টারমশায়রা

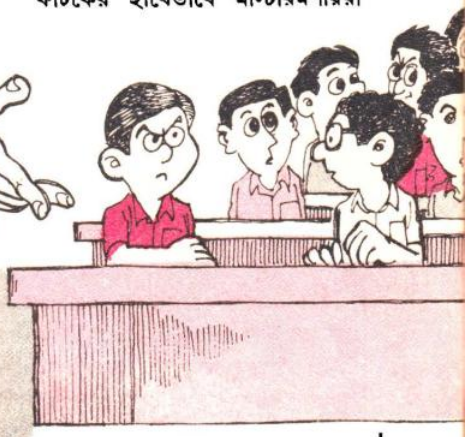

বোঝেন এ বড় শক্ত ঠাঁই। আসল কথা সহজে বার করা যাবে না। তাই বাধ্য হয়ে ওকে ক্লাসে যেতে বললেন।

ফটিক চলে যায় দুই মাস্টারমশায়কে অকূল পাথারে ভাসিয়ে। রবিবাবু গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন। খানিকক্ষণ বাদে তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন, আচ্ছা, প্রশ্নপত্র প্রেস থেকে বের করে আনেনি তো?

দীনেশবাবু বললেন, তা কী করে সম্ভব। পঁচিশ বছর ধরে প্রেস আমাদের প্রশ্ন ছাপছে, কোনো অভিযোগ নেই, শুধু শুধু তাদের দোষ দিয়ে—

রবিবাবু কথা টেনে বললেন, একবার চল না প্রেসে গিয়ে খোঁজখবর নিই। প্রেসে এখন নিত্য নতুন ছেলে আসছে, কে কোথা থেকে বের করেছে তার ঠিক আছে!

দুই মাস্টারমশায় গেলেন প্রেসে। এদিকে আমাদের কাছেও খবরটা পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটলাম ফটিককে বলতে। শুনে ফটিক তো রেগে আগুন। বললে, তোরা ভাবিস কি বল তো। ফুল নম্বরগুলো শুধু তোদের জন্যই। একটু খেটে যে আমি ফুল নম্বর পেয়েছি তাতেও তোদের হিংসে, পিছনে লেগেছিস। দেখবি অ্যানুয়ালে আর সব বিষয়েই ফুল মার্কস পাব। বলেই বিজ্ঞান বইয়ের পাতা উল্টে চুম্বকের পরিচ্ছেদটা খুলে ডুবে গেল গভীর অধ্যয়নে।

ওদিকে দুই মাস্টারমশায়ের কাছে আদ্যোপান্ত শুনে প্রেসের মালিক অজয়বাবু

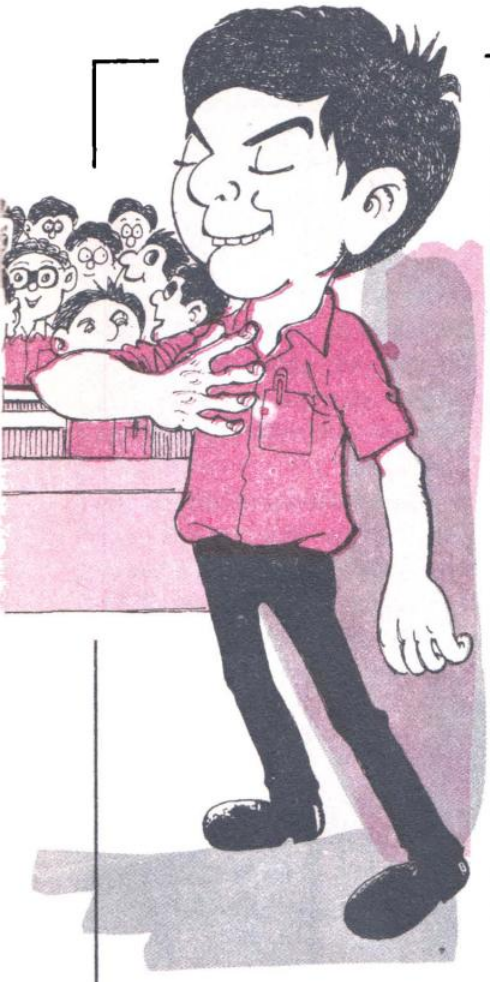

অবাক হলেন, বললেন, পঁচিশ বছর ধরে প্রশ্ন ছাপাচ্ছি, কোনোদিন কোনো অভিযোগ হলো না, আর আজ—

এবারে যখন প্রশ্ন ছাপানো হয় তখন আপনি নিজে ছিলেন তো? প্রুফ আপনি নিজে দেখেছেন? দীনেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন বিনীত হয়ে।

অজয়বাবু বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে। কাক-পক্ষীও টের পায় না এসব কাজ।

দীনেশবাবু এবং রবিবাবু দুজনেই ফিরে এলেন। রবিবাবু বললেন, গোপনে আমি খবর নেব প্রেসের লোকের কাছে, দেখি ফটিক কতবড় চালাক। এখনও অ্যানুয়াল পরীক্ষা বাকি, তুমি ভেবো না দীনেশ।

সঠিক কারণ না বের করতে পারায় পরের দিনই আরেকবার ধমক খেলেন দুই মাস্টারমশায়। ফটিক এ খবর জেনে বললে, আমাকে কেউ আর স্কুলে টিকতে দেবে না দেখছি। ঠিক আছে আমারও নাম ফটিক দে।

রোজই স্কুলে যাই। দেখি রবিবাবুর মুখ ফ্যাকাশে, দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। বুঝতে পারি এখনো গভীর তদন্ত চলেছে। দিন পনের এমনিভাবে কাটে। তারপর হঠাৎ একদিন দুই মাস্টারমশায়ের মুখেই হাসি ফোটে। আমরা ভাবি তাহলে কি ফটিকের ফুল নম্বর রহস্য সমাধান করতে পেরেছেন ওনারা?

ফটিক কিন্তু খুব সতর্কভাবে ক্লাস করে। যদিও মাঝে-মধ্যে অতি চালাকি করতে গিয়ে ধরাও পড়ে যায়। তবে চরিত্রটা তার বাঁশের মতন। নুইয়ে মাটিতে মিশে যাবে তবু ভাঙবে না।

অ্যানুয়াল পরীক্ষা এসে গেল। যে যার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। ফটিকও। ক্লাসের ফার্স্ট বয় তোতন ভয়ে রাতে ঘুমনোই ছেড়ে দিল। ফটিক যদি ফার্স্ট হয় এবার, তোতনকে লজ্জায় না স্কুলই ছেড়ে দিতে হয়।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা এল, হলো এবং একদিন শেষও হয়ে গেল। ফটিককে সেদিন জিজ্ঞাসা করি, কীরে তোতনকে ডিঙোতে পারবি তো? তোর উপর কিন্তু অনেক আশা আমাদের।

ফটিক প্রায় কামড়ে দিতে এল, সবাই মিলে আমার পিছনে লেগেছিস কেন বল তো! এত কুদৃষ্টি সহ্য হয়? আমিও ছাড়ছি নে।

কীসের কুদৃষ্টি, কী ছাড়ছে না কিছুই বুঝতে পারলাম না, শুধু বুঝলাম ওকে আর ঘাঁটানো উচিত হবে না।

পরীক্ষার ক'দিন পর দেখি দীনেশবাবু আর রবিবাবু বেশ খোশমেজাজে গল্প করছেন। কাজের অছিলায় দু'একবার ওনাদের পাশ দিয়ে গেলাম। কিন্তু না, ফটিকের নম্বর রহস্যের কিছু শুনতে পেলাম না। যাকগে আর ক'দিন পরই তো রেজাল্ট বেরবে।

দেখতে দেখতে সে দিনটাও চলে এল। আমরা সবাই ফটিকের নম্বর জানার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছি। কোনো এক কারণে ফটিক আজ স্কুলে আসেনি।

রবিবাবু, দীনেশবাবু দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, ফটিকচন্দ্র কোথায়?

আমরা বললাম—ও আজ আসেনি স্যার।

কী, বলেছি না রবি তোমাকে? দীনেশবাবু বললেন। রবিবাবু বিড়বিড় করে বললেন, হাতের কাছে পেলে ফটিককে ফটকিরির মতন একবার ঘষে দেখতাম।

রেজাল্ট দেবার আগে রবিবাবু বললেন, তোমাদের ক্লাসের চল্লিশ জনের উনচল্লিশ জন পাশ করেছ, একজন ফেল। সে হলো ফটিক দে। গতবারে ইংরাজী, অঙ্কে ফুল নম্বর পেয়েছিল, এবারে দুটোতেই গোল্লা। অতি চালাকের গলায় দড়ি।

আবার অবাক আমরা। ফটিক বলেই বোধহয় এটা সম্ভব। তা বলে বিলকুল ফেল!

ফটিক নতুন ক্লাসে আর আসতে পারবে না ভেবে খারাপ লাগছে। করারই বা কি আছে!

সেদিন হেডমাস্টারমশায়ের কাছে ফটিকের বাবা এলেন। শিলিগুড়িতে থাকেন। বছরে দু-তিনবার আসতে পান। ফটিকের রেজাল্টে খুব লজ্জিত হয়ে বললেন, সামনের মাসেই চলে আসছি এখানে বদলি হয়ে, নিজে দেখতে পাব এবার। যা বদমায়েশ হয়েছে ছেলেটা। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, হাফ ইয়ার্লিতে এত ভাল হলো আর এবার—

হেডমাস্টারমশায় চক দিয়ে টেবিল ঠুকতে ঠুকতে বললেন, সেজন্যই তো ডেকেছি আপনাকে। গুণধরের কীর্তি শুনুন।

ফটিকের বাবা এগিয়ে যান। হেডমাস্টার-মশায় বললেন, প্রেসের ছেলেদের হাত করে হাফ ইয়ার্লিতে প্রশ্ন যোগাড় করেছে। রবিবাবু সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে আমি তা বিশ্বাস করি। ওনাকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। শুধু ফটিক কিনা কে জানে, আরও অনেক ছাত্র জড়িত থাকতে পারে ভেবে আমরা এবার দু' জায়গায় দু'রকম প্রশ্ন ছাপি। অজয়বাবুর প্রেসের প্রশ্ন রেখে দিয়েছি। আর অন্য প্রেসের প্রশ্ন ছাত্রদের দিয়েছি। ফটিকবাবু নকল প্রশ্ন যোগাড় করে তৈরি হয়েছিল কিন্তু প্রশ্নপত্র তা ছিল না। কিছু বুঝলেন?

ফটিক বোধহয় জানত না' যে চালাকি করে মহৎ কাজ করা যায় না।

ছবি : উজ্জ্বল ধর

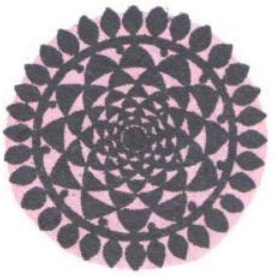

সদানন্দ ফিরে আসেন

সুখেন্দু দত্ত

সদানন্দ মারা গেলেন। অমরেন্দ্র যাচ্ছিলেন, খবরটা তিনিই দিয়ে গেলেন।

বড় ভাল মানুষ ছিলেন সদানন্দ। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। দুটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে তাঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই অকূলে পড়েছেন। এই দুঃসময়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আমার আর কিই বা করার আছে?

সন্ধ্যাবেলা গেলাম তাঁদের বাড়িতে। ঝি দরজা খুলে আমাকে দেখেই হাউমাউ করে ওঠে, 'আপনি এসেছেন, বাবু! আমরা তো ভয়েই মরি। ভাবলুম, কর্তাই বুঝি আবার এলেন!'

'কর্তা?' আমি জিজ্ঞাসা করি। 'কি ব্যাপার?'

'বাড়িসুদ্ধ আমরা ভয়ে মরি।' ঝি বলে। 'আপনি এলেন, আমরা বাঁচলুম, বাবু!'

শোকাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যেই বাড়ির সবাই কেমন ভীত, বিব্রত। শৈলজার দৃষ্টিও ভয়চকিত, উদভ্রান্ত। ঝি আবার বলে, 'কর্তা কাল রাতে মারা গেলেন। আজ তিনিই আবার এসেছিলেন, বাবু!'

'কে? সদানন্দবাবু?' আমি বিস্মিত।

'হ্যাঁ, বাবু!' বলতে বলতেই ঝি কেঁদে ওঠে। 'জীবনে এমন কাণ্ড শুনিনি! কি হবে, বাবু?'

তারপর সে যা বলে তা এই। বন্ধ দরজায় ঠকঠক শব্দ হতে চাকর গিয়ে দরজা খুলে দেয়। তারপরই ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে সে। সন্ধ্যার আবছা আলোয় সে স্পষ্ট দেখতে পায়, দরজায় দাঁড়িয়ে কর্তা! তিনি এক পা এগোতেই চাকরটা তো গোঁ-গোঁ করে মাটিতে পড়ে যায়।

'তা কি করে হয়?' আমি বলি। 'মানুষটা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে তো সবই শেষ হয়ে যায়!'

'বললে পেত্যয় যাবেন না, বাবু! আমিও পরিষ্কার দেখতে পেলুম। চাকরটা পড়ে যেতেই গিন্নিমা এদিকে ফেরেন। দরজার দিকে চোখ পড়তেই তিনিও 'আঁ-আঁ' করে পড়ে যান।'

'হঠাৎ এরকম একটা শোক পেয়েছেন। তার ওপর শরীরও দুর্বল।' আমি বলি। 'এই অবস্থায় মানুষ অনেক ভুল দেখে।'

'আমরা এতগুলো মানুষ ভুল দেখলুম, বাবু?' ঝি চোখ উল্টে বলে। 'গিন্নিমা পড়ে যেতেই আমি চেঁচিয়ে উঠি। ছেলেমেয়ে দুটোও ভয়ে চিৎকার করে ওঠে।'

এরকম একটা অভ্যর্থনার জন্য সদানন্দও বোধহয় তৈরি ছিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি

পিছন ফেরেন।

শোকে-দুঃখে মানুষগুলোর জ্ঞান-বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে দেখছি! যে মানুষটা একদিন আগে মারা গেছেন, শ্মশানে যাঁর দাহ পর্যন্ত হয়ে গেছে, তিনি আবার ফেরেন কি করে?

গেঁয়ো ভূত, মেছো ভূত, বেলগাছের ব্রহ্মদত্যি, শ্যাওড়া গাছের পেত্নি, ডাকিনী, যোগিনী, শাঁকচুন্নির গল্প শুনেছি। কিন্তু তারা সব সেকেলে গেঁয়ো ভূত। এমন শহুরে ভূতের কথা তো জন্মে শুনিনি! ভুল দেখেছেন তারা।

কিন্তু সেকথা কাউকে বোঝানো গেল না। না, ভুল তাঁরা দেখেননি। ভুল শোনেনওনি। সদানন্দের দরজায় ঠক-ঠক করার সেই বিশেষ ধরনটিও তাঁদের পরিচিত। চাকরটা একেবারে সামনা-সামনি তাঁকে দেখেছে। শৈলজা নিজেও দেখেছেন। ঝি আর ছেলেমেয়ে দুটোও দেখেছে। না, কোনো ভুল নেই।

শৈলজা হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ওঠেন, 'উনি মরে গিয়েও শান্তি পাচ্ছেন না!' ভয়ার্ত, অসহায়, করুণ গলা তাঁর!

তবে কি সত্যি অলৌকিক কিছু? মৃত্যুর পর কোথায় যায় মানুষ? দেহের বিনাশের

সঙ্গে সঙ্গে নাকি আত্মার বিনাশ হয় না। সে নাকি আরও কিছুকাল থাকে পৃথিবীতে। আপনজনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে।

ঠিক তখনই দরজায় গায়ে শব্দ হয়, ঠক-ঠক-ঠক!

'ঐ আবার!' ঝি আঁতকে ওঠে।

'এই শব্দ আমি চিনি!' শৈলজা ভয়ার্ত গলায় বলে ওঠেন।

'না, না!' আমি বলি। 'বাতাসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।'

'না, কর্তাই!' ঝিয়ের গলার স্বরে আতঙ্ক। চাকরটাও ভয়ে বু-বু করে ওঠে।

আজ রাতটাও আবার হয়েছে তেমনি! একে তো অমাবস্যার রাত। চারিদিকে কালো ঘুচঘুচে অন্ধকার। তার উপর আবার সন্ধ্যা থেকেই খ্যাপাটে বৃষ্টি!

ঠিক তখনই দরজায় আবার সেই ঠক-ঠক শব্দ! এবার একটু জোরে! সাড়া দিতে গিয়েও দিতে পারি না। আত্মা ও আধি-ভৌতিক ব্যাপারে আমার কৌতূহল আছে। নিজেকে সাহসী বলেও জানি। তাই সামলে নিই। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। দরজা খোলার আগে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করি, 'কে?'

'আমি। দরজা খুলুন!' ওপাশ থেকে সাড়া আসে।

সদানন্দের গলাই তো! কি ভয়ানক! গায়ে আমার শুধু কাঁটা দিয়ে ওঠে না, মাথার চুলও খাড়া হয়ে ওঠে। দরজা খুলতে ভয় পাই। কি জানি, যদি—

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিই। নিজের এই দুর্বলতার জন্য নিজের কাছেই লজ্জা পাই। এত দুর্বল মন আমার!

দরজাটা খুলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া! আমার সারা গা কেঁপে ওঠে। তারপরই খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠি। সামনেই দরজাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সদানন্দ! মুখটা তাঁর ম্লান, বিষণ্ণ!

আমার বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। এও কি সম্ভব? কিন্তু না, ভুল হবার কিছু নেই। সেই চেহারা, ফর্সা রং, মাথায় অল্প চুল। দরজার পাল্লায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। কোটরাগত দুই চোখ জ্বলজ্বল করছে।

আবার এক ঝলক ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে হাওয়া। একটা বরফের স্রোত যেন আমার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যায়!

শৈলজার মুখ হয়ে যায় ছাইয়ের মতো সাদা। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েন তিনি। ভয়ে বিবর্ণ ঝি কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে যায়। যে ঐ দেশে একবার চলে যায়, সে ফিরে আসুক তা কেউ চায় না। তার আপনজনও না!

আমারও হাত-পা কাঁপছে ঠক-ঠক করে। ভয়ানক একটা কিছু যেন ঘটতে যাচ্ছে! দূরে কোথা থেকে একটা কুকুরের কান্না ভেসে আসে।

সদানন্দ থমকে দাঁড়ান। ঘরের অবস্থাটা একবার তাকিয়ে দেখে নেন। তারপর কয়েক পা এগিয়ে আসেন।

বাতাসের ধাক্কায় পিছনের দরজাটা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায়। ঠাণ্ডায় আমার হাত-পা জমে যাচ্ছে! ঠাণ্ডায় নয়, ভয়ে! স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না। বুকের ভিতরটা লাফাচ্ছে। যেন এখনি ফেটে যাবে।

কুণ্ঠিত পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন সদানন্দ। মৃত্যুর পরেও প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসার লজ্জাই বোধহয়। অজ্ঞান হইনি, তবে তার দেরিও বোধহয় ছিল না। চেয়ারটা ধরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে থাকি।

একটু ইতস্তত করেন সদানন্দ। তারপর বলেন, 'আগেও একবার এসেছিলাম। তা, আমাকে দেখেই সবাই এমন করে ওঠেন যে...'

দুঃখে সদানন্দের গলাটা ভারী হয়ে ওঠে। কথাটা উনি আর শেষ করতে পারেন না।

বিহ্বলভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কি বলতে চান উনি? কথাগুলো শুনছিলাম বটে, কিন্তু আমার মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

ভয়ে তখন আমার গলা শুকিয়ে গেছে। মুখ হয়ে গেছে ফ্যাকাসে। আমি কি ভুল দেখছি, না ভুল শুনছি? তাই বা কি করে হয়? এই তো উনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন! এর মধ্যে ভুলের তো কিছু নেই!

'ভিতরে আসব?'

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠি। মৃত্যু এসে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে বলে কি মানুষটা তাঁর নিজের বাড়িতেও আসতে পারবে না?

'আ-আসুন!' গলার স্বর আমার কাঁপা।

ঘরে ঢুকে তাঁর প্রিয় সোফাটার উপরই গিয়ে বসেন সদানন্দ! চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাবার সাহসও আমার আর নেই। পিছনে শৈলজা বিড়-বিড় করে প্রলাপ বকে চলেছেন, 'একবার মরে গিয়ে তো কেউ ফিরে আসে না! তুমি কেন এলে, তুমি কেন...'

তাঁর অবস্থা দেখে বিব্রত হন মানুষটা। বলেন, 'আহা! শোকে-দুঃখে কি অবস্থা!' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন তিনি।

একটু থেমে তিনি আবার বলেন, 'তা, এমন হঠাৎ! কি হয়েছিল ওঁর?'

কি হয়েছিল? আশ্চর্য, তাও ভুলে গেছেন সদানন্দ? তাঁর কথা শুনে ডুকরে ওঠেন শৈলজা। এবার একটু যেন লজ্জিত হন সদানন্দ। বলেন, 'হ্যাঁ, এত কাছে থেকেও তো কোনো খবর রাখতে পারিনি। ব্যাপারটা সত্যি লজ্জার। সব ঘটে যাবার পরই শুধু জানলাম। শেষ দেখাটাও হলো না!'

'শেষ দেখাও হলো না?' আমি হতবাক। 'মানে?'

'মন কষাকষি ছিল দুই পরিবারে।' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন। 'পাশাপাশি শহরে থেকেও দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। তবে রক্তের টান যাবে কোথায়? খবর জেনে ছুটে আসতে হলো। এখন তো সব শেষ!' সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলেন তিনি।

তারপর ম্লানভাবে একটু হাসেন। বলেন, 'এবার তো আমারও ডাক পড়বে। এক ঘণ্টার বড় ছিলেন আমার!'

এক ঘণ্টার বড়? এসব কথার মানে কি? জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে তাকাই।

'হ্যাঁ, যমজ ভাই ছিলাম আমরা। টুইন ব্রাদার্স!'

যমজ ভাই! আমার দুই ভুরু কপালে উঠে যায়। তাই বলে দু'জন মানুষের হাবভাব, চেহারা, কথাবার্তায় এমন মিল! ভয় পাবার মতোই ব্যাপার বটে! বাড়ির মানুষের আর দোষ কি!

ছবি ঃ সঞ্জয় সরকার

৭-তলা মামাবাড়ি

সুবোধ তালুকদার

পরীক্ষা হয়ে গেলেও কিন্তু বন্টুকে ফর্মুলা মুখস্থ করতে হচ্ছে। আর হবে নাই বা কেন, সাত-সাতটি মামার নাম মনে রাখা কি চাট্টিখানি কথা। মামাবাড়ি যাবে আর মামাদের নাম জানবে না, এও কি হয়? সেই কবে একবার মামাবাড়ি গিয়েছিল, ভালো করে মনেও নেই। অগত্যা, আউড়ে যাচ্ছেই—শ্রী পূর্ণেন্দু গুহ রায়, শ্রী বোধেন্দু গুহ রায়, শ্রী শুভেন্দু গুহ রায়, শ্রী কৃষ্ণেন্দু গুহ রায়, শ্রী নবেন্দু গুহ রায়, শ্রী জ্ঞানেন্দ্র গুহ রায়, শ্রী তপেন্দ্র গুহ রায়।

বন্টুর মাথা আর ঠিক থাকছে না। মাথারই বা দোষ কী। ওই মাথার ওপর দিয়েই মাধ্যমিক পরীক্ষার ধকলটা তো আর কম যায়নি। তাই বলে পিছিয়ে আসবে বন্টু? তা কখনওই নয়। মাথা খাটিয়ে ঠিক ফর্মুলা বের করে ফেলেছে সে। শেষের দুই মামা প্রথমে একটু গোলমাল পাকালেও এখন আর কোনও গোলমালই নেই। তাছাড়া, গোলমাল থাকবেই বা কেন! অঙ্ক যে। অঙ্ক দিয়ে যে সবকিছুরই সমাধান সম্ভব তা কি আর জানে না বন্টু। অঙ্কের স্যারেরা কি আর এমনি এমনি ভালোবাসে ওকে! তবুও কিন্তু বাড়ির টিউটরকে দিয়ে ফর্মুলাটা ভেরিফাই করিয়ে নিয়েছে সে। ভেরিফাই করিয়ে, একশভাগ নিশ্চিত হয়ে তবেই বন্টু মুখস্থ করে চলেছে—শ্রী [{(পূর্ণ + বোধ + শুভ + কৃষ্ণ + নব) ইন্দু} + {(জ্ঞান + তপ) ইন্দ্র}] গুহ রায়।

কিন্তু এতেই যদি ঝামেলা মিটে যেত তবে তো আর কথাই ছিল না। শুধু নাম মনে রাখলেই তো হবে না, মনে রাখতে হবে কোন মামাকে কী বলে ডাকবে তাও। বড়মামা, মেজমামা, সেজমামাকে ডাকার ব্যাপারটা অবশ্য সোজাই, বাঁকটাক নেই। কিন্তু, তারপরেই বাঁকের পালা। ন-মামা, চিনি-মামা, রাঙা-মামা, কুট্টি-মামা। আবার এতেই শেষ নয়, মামিদের ডাকার ব্যাপারটাও আছে। এই ডাকাডাকির ব্যাপারগুলোতে প্রশ্নপত্রের মতো অ্যাতো প্যাঁচ কেন তা কিছুতেই ঢোকে না বন্টুর মাথায়। এর চাইতে, ক-মামা, ক-মামি/খ-মামা, খ-মামি/গ-মামা, গ-মামি...বলে ডাকলেই তো কত সহজ হয় ব্যাপারটা। কিন্তু, বন্টুর ইচ্ছেয় তো আর সবকিছু হবে না। তাই বলে কি মামাবাড়ি যাবে না বন্টু? কত কষ্টে ট্রেনের টিকিট পাওয়া গেছে তা কি জানে না সে!

কাজেই, মামাবাড়ি সে যাবেই, কিছুতেই দমবে না। আর তাই অনেক ভেবে মনে রাখবার সহজ উপায়ও বের করেছে বন্টু। উপায় আর কী—আর একটা ফর্মুলা বের করে ফেলেছে। ফর্মুলাটার ওপর আর একবার চোখ বোলায় সে—[{(বড় + মেজ + সেজ) (মামা + মামি)} + {(ন + চি + রা + কু) (মামা + মামি)}]। ফর্মুলাটা, বিশেষ করে শেষের 'নচিরাকু' মামা ও মামির বেলায় ঠিক ঠিক হলো কিনা মনে মনে তা ঝালিয়ে নিতে থাকে বন্টু—ন-তে ন-মামা ও ন-মামি, চি-তে চিনি-মামা ও চিনি-মামি, রা-তে রাঙা-মামা ও রাঙা-মামি, কু-তে কুট্টি-মামা ও কুট্টি-মামি—না, কোনও ভুল নেই। খুব খুশি হয় বন্টু। সাত-সাতটি মামা-মামিকে ডাকার ব্যাপারটাই যখন সলভ্ করতে পেরেছে, মামাতো ভাই-বোনদের ডাকার ব্যাপারে তখন আর ভাবনা কি। বয়সটা মোটামুটি আন্দাজ করে দাদা-দিদি, ভাই-বোন বলে চালিয়ে দিলেই হবে।

নির্দিষ্ট দিনে মার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে, সময়মতো ফর্মুলাটা যাতে মনে পড়ে সেইজন্য মা সরস্বতীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে, ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বন্টু। ঠিক স্টেশনে নেমে, ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ির সামনেও এসে হাজির হয়। কিন্তু, বাড়ি দেখে বন্টুর চোখ তো একেবারে ছানাবড়া! ভুল হয়নি তো? ঠিকানাটা বের করে আবার মিলিয়ে দেখে সে। নাঃ, ঠিকই আছে। ভয়ে ভয়েই আঙুল ছোঁয়ায় কলিংবেল-এ।

কলিংবেল টিপেই পিছিয়ে আসে বন্টু। পিয়ানোর বাজনা শুনে থতমতও খায়। অনেকদিন আগে, এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ঠিক এরকম বাজনাই শুনেছিল সে। বন্ধুর দিদি বাজাচ্ছিল সেদিন। কিন্তু...

কাকে চাই? গ্রিল দেওয়া বারান্দার ভেতর থেকেই জিজ্ঞেস করেন এক মহিলা।

এটা কি মামাবাড়ি? দোনোমনো করেই জিজ্ঞেস করে বন্টু।

মামা! কার মামা? কোন মামা—একগুচ্ছ প্রশ্নে হকচকিয়ে যায় বন্টু। কার নাম বলবে সে? মামা তো সাতটি!

কী হলো, কিছু বলছ না যে। মামার নাম ভুলে গেছ? বিরক্তই হন মহিলা।

না, না, ভুলিনি। মানে—খানিকটা সামলে নিয়ে, মা সরস্বতীকে স্মরণ করে, ফর্মুলার সাহায্যে বন্টু পরপর বলে যেতে থাকে মামাদের নাম—

ও, বুঝেছি, বুঝেছি। তোমারই নাম—শ্রী ব্যালট রায়। ডাক নাম বন্টু।

ও, বন্টু! তোমারই তো আসবার কথা আজ।

বন্টু হাঁফ ছেড়ে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

এসো, এসো বলেই আড়ালে চলে যান তিনি এবং তারপরেই দরজা খুলে ডাকেন, ভেতরে এসো।

আচ্ছা তুমি, মানে—আমতা আমতা করে বন্টু।

আমি সবার ছোট। হেসে ফেলেন সেই মহিলা।

ও, তুমিই কুট্টিমামি। টিপ করে প্রণাম করে বন্টু। প্রণাম করতে পেরে অনেকটাই হাল্কা হয়ে আদুরে গলায় বলে, দাদু-দিদিমা, আর আর মামা-মামিরা সব কোথায়? প্রণাম করব।

করবে, করবে। সবাইকেই প্রণাম করবে। অত তাড়ার কিছু নেই। যখন যে-তলাতে যাবে, তখনই প্রণামের কাজটা সারতে পারবে। নিচু থেকে ওপর বা ওপর থেকে নিচু, ছোট থেকে পরপর বড় বা বড় থেকে পরপর ছোট—কোনও অসুবিধে নেই।

আর দাদু-দিদিমা?

দাঁড়াও, রুটিন-কার্ড দেখে বলছি। রুটিন-কার্ড দেখতে ঘরের এক কোণে চলে যান বন্টুর কুট্টিমামি।

রুটিন কথাটার সঙ্গে বন্টুর পরিচয় থাকলেও রুটিন-কার্ড কথাটা প্রথম শুনল সে। অবশ্য, রেশন-কার্ড কথাটা তার জানা।

বুঝলে বন্টু, আজ রোববার তো, তাই তোমার দাদু ৬-তলায় অর্থাৎ তোমার মেজ-মামার ঘরে আর তোমার দিদিমা ২-তলায় অর্থাৎ—

রাঙামামার ঘরে। কুট্টিমামির মুখের কথাটা কেড়ে নিয়েই বলে বন্টু।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই তো ঠিক বুঝে গেছ। বুদ্ধিমান ছেলে!

কুট্টিমামির প্রশংসা শুনে মুখটা নিচু করে বন্টু। তারপর নিচের দিকে মুখ করেই বলে,

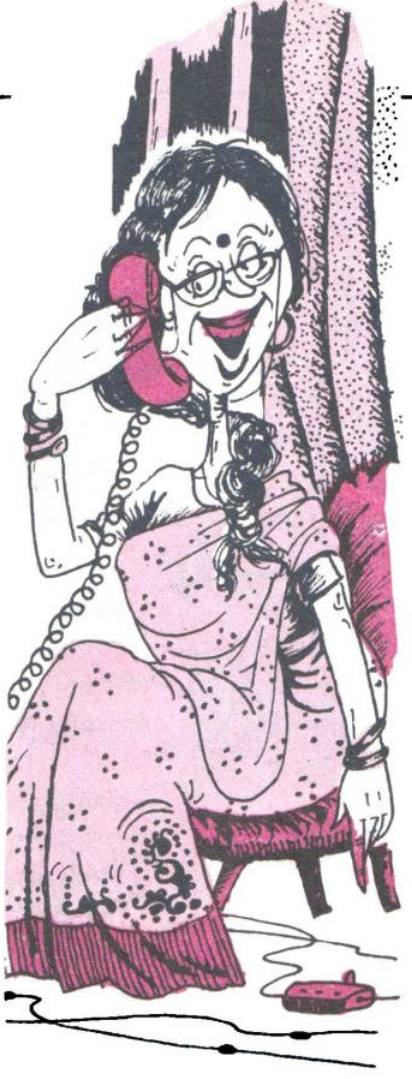

তাহলে সবাইকে প্রণামটা সেরে আসি কুট্টিমামি?

সে হবেখন। তার আগে তোমার রুটিন-কার্ডটাও করে দিতে হবে। একটু বোসো। তোমার বড়মামির সঙ্গে কথা বলে এক্ষুণি করে দিচ্ছি।

বড়মামি—মানে ৭-তলা!

হ্যাঁ, ৭-তলা। তবে একটুও দেরি হবে না। ইন্টারকমের বোতাম টিপলেই পেয়ে যাব।

ইন্টারকম! সেটা আবার কী কুট্টিমামি?

ও একরকম ফোনই। তবে একেবারে নিজস্ব ব্যবস্থা। মানে, নিজেদের ঘরে ঘরে কথা বলার জন্যেই এই ফোন।

তাহলে তো ঘর-ফোনও বলা যায়।

বাংলায় কী বলে জানি না। বলেন বন্টুর কুট্টিমামি, তবে তোমার ইচ্ছে হলে তুমি ঘর-ফোনও বলতে পার।

ফোনে দু-একবার কথা বললেও ঘর-ফোন কোনওদিন দেখেনি বন্টু। তাই কুট্টিমামির পেছনে পেছনে যন্ত্রটির কাছে যায়। খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। দেখে, কুট্টিমামি ৭-নং বোতাম টিপে রিসিভারটি কানে তোলেন। একটু পরেই দুই মামির কথাও শুনতে পায় বন্টু—

হ্যালো বড়দি, আমি ছোট বলছি।

কী বলছিস ছোট?

ভাগনে বন্টু এসেছে।

কখন এল?

এই তো কয়েক মিনিট। ওর রুটিনটা তো করে দিতে হয় বড়দি।

ক'দিনের?

এক মিনিট বড়দি—বন্টু তুমি ক'দিন থাকবে?

বেশ কয়েকদিন থাকার ইচ্ছে নিয়েই এসেছে বন্টু। পরীক্ষা শেষ। কাজও নেই এখন। হাতে অনেক সময়। কিন্তু, বলার সময় মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, তিনদিন—

হ্যালো বড়দি, তিনদিন।

তিনদিন মানে, আজ থেকে তিনদিন?

এক মিনিট বড়দি—বন্টু আজ থেকেই তিনদিন তো?

বন্টু মাথা ওপর-নিচ করে।

হ্যাঁ বড়দি, আজ থেকেই তিনদিন।

তার মানে, বুধবার সকালেই ফিরে যাচ্ছে?

হ্যাঁ। তাই-ই।

তাহলে মিল হলো ৬-টা। জলখাবার কটা হচ্ছে রে ছোট?

তা, ধরো সকাল-বিকেল মিলিয়ে তিনদিনে ৬-টা আর বুধবার সকালের ১-টা, মোট ৭-টা।

ঠিক আছে রুটিনটা করে ফ্যাল।

আমি করছি, তুমিও শোনো বড়দি। কোথাও ভুল হলে ঠিক করে দিও।

বন্টুর কুট্টিমামি রুটিন-কার্ড নিয়ে লিখতে শুরু করেন এবং লিখতে লিখতে বন্টুর বড়মামিকেও শোনাতে থাকেন। শোনে বন্টুও—

রোববার :

সকালের জলখাবার — ৬-তলা
দুপুরের মিল — ২-তলা
বিকেলের জলখাবার — ৭-তলা

রাতের মিল — ১-তলা

সোমবার :

সকালের জলখাবার — ৪-তলা
দুপুরের মিল — ৭-তলা
বিকেলের জলখাবার — ৫-তলা
রাতের মিল — ৬-তলা

মঙ্গলবার :

সকালের জলখাবার — ২-তলা
দুপুরের মিল — ৫-তলা
বিকেলের জলখাবার — ৩-তলা
রাতের মিল — ৩-তলা

বুধবার :

সকালের জলখাবার — ১-তলা
ট্রেনের খাবার — ৪-তলা

হ্যালো বড়দি, ন-দির একটা মিল কম হচ্ছিল বলে ট্রেনের খাবারের ব্যবস্থাটা ওখানেই রাখলাম।

ঠিকই করেছিস ছোট। সবাইকে রুটিন জানিয়ে বন্টুকে রুটিন-কার্ডটা ধরিয়ে দে। হ্যাঁ, ভালো কথা, রুটিনের একটা কপি রেখেছিস তো?

সে কী আর তোমাকে বলে দিতে হবে বড়দি! কার্বন-পেপার লাগিয়েই কপি করেছি।

বেশ, বেশ। বন্টুকে ভালো করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিস কিন্তু।

ঠিক আছে। ছাড়ছি বলেই রিসিভারটি রেখে বন্টুর দিকে মুখ ফিরিয়ে কুট্টিমামি বলেন, এই নাও বন্টু তোমার রুটিন-কার্ড। ভালো করে বুঝে নাও রুটিনটা। যে-তলায় যাবার কথা, সে-তলায় না গিয়ে ভুল করে অন্য তলায় ঢুকে পড়লেই কিন্তু বিপাকে পড়বে। তাই, ভালো করে বুঝে নাও। কোথাও অসুবিধে হলে জিজ্ঞেস কোরো, কেমন। দিদিমণির মতো করেই কথাগুলো বলেন বন্টুর কুট্টিমামি।

রুটিন-কার্ড বানাবার সময় দুই মামির কথা শুনে অনেকটাই বুঝে গিয়েছিল বন্টু। তবুও কুট্টিমামির কথায় রুটিনে চোখ বোলায়। সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত—না, খাবার ব্যাপারে কোনও গোলমালই নেই। কিন্তু, যে প্রয়োজন মেটানোটা আশু দরকার, রুটিন-কার্ডে তারই কোনও উল্লেখ নেই দেখে বন্টুর মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। সারারাত ট্রেনে যেভাবে এসেছে তাতে পেটের দরকারের চাইতে চোখের দরকার মেটানোটাই বেশি জরুরি। তাই, ঢোক চিপে, শুকনো

গলায় জিজ্ঞেস করে বন্টু, ঘুমবো কোথায় কুট্টিমামি? এখানে তো—

ও, ওটা লেখার দরকার হয় না। খুবই সহজ ব্যাপার। সহজ ব্যাপারটা আরও সহজ করে দিতে, সহজভাবেই বলেন বন্টুর কুট্টিমামি, রাতের মিল যে-তলাতে, ঘুমের ব্যবস্থাও সেই তলাতেই।—আচ্ছা বন্টু, বলো তো আজ কোথায় ঘুমোবে?

চোখে অন্ধকার দেখলেও কোনওরকমে রুটিন-কার্ড দেখে বন্টু বলে, ১-তলা মানে তোমার এখানে।

চৌকস ছেলে! খুশিই হন বন্টুর কুট্টিমামি। তবুও, বন্টুকে আর একবার যাচাই করে নেবার জন্যে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা বন্টু, রুটিন-কার্ড দেখে বলো তো, আজ সকালের খাবার খেতে কোন তলায় যাচ্ছ?

বন্টুর চোখের সামনেই ধরা আছে রুটিন-কার্ডটা। তাই দেখে বলে, ৬-তলা মানে মেজমামার ওখানে।

ভেরি গুড। তাহলে এখন সোজা ৬-তলায় চলে যাও। আর হ্যাঁ, রুটিন-কার্ডটা হারাবে না কিন্তু। হারালেই অসুবিধেয় পড়বে। রুটিন-কার্ড দেখে দেখে সকাল, দুপুর, বিকেল ও রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। কোনও অসুবিধেই হবে না।

না, না, এ আর এমন কী অসুবিধে। ১-তলা থেকে ৭-তলার মধ্যেই সব ব্যবস্থা। কথাটা বলতেই হয় বন্টুকে। তারপর, এক হাতে ব্যাগ এবং অন্য হাতে রুটিন-কার্ড নিয়ে ৬-তলা অর্থাৎ মেজমামার ওখানে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। একটু গিয়েই ফিরে আসে বন্টু।

কী হলো বন্টু? কিছু বলবে?

না—মানে, দাদু-দিদিমা কোন তলায় যেন বললে কুট্টিমামি?

এক মিনিট বন্টু, রুটিন-কার্ড দেখে বলছি। রুটিন-কার্ড দেখে বন্টুর কুট্টিমামি বলেন, বুঝলে বন্টু, তোমার দাদু আজ ৬-তলায় এবং তোমার দিদিমা ২-তলায়।

ও, আচ্ছা। আবার পা বাড়ায় বন্টু।

বন্টু শোনো। এবারে বন্টুর কুট্টিমামিই ডাকেন। পেনটা দিয়ে বলেন, এই নাও পেন। তারকাচিহ্ন দিয়ে লিখে নাও—আজ ৬-তলার ঘরে দাদু আর ২-তলার ঘরে দিদিমা। তবেই আর ভুল হবে না।

কুট্টিমামির উপদেশ মতোই কাজ করে বন্টু। তারপরে বলে, তাহলে ২-তলায় দিদিমাকে প্রণামটা করেই ৬-তলায় যাই কুট্টিমামি?

না, না, ওটি করতে যেও না। রুটিনের বাইরে কোনওকিছুই করা চলবে না। তাছাড়া, প্রণাম করার জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? রুটিন অনুযায়ী আজ দুপুরের মিল খেতে গিয়েই তো তোমার দিদিমার দেখা পাবে। আর প্রণামের কাজটা তখনই সারতে পারবে।

ও, আচ্ছা। সেই ভালো। তখনই প্রণাম করব। কুট্টিমামির কথা শিরোধার্য করে ৬-তলার উদ্দেশে পা বাড়ায় বন্টু।

ছবি : সুদীপ্ত মণ্ডল

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

কিশোর সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

গল্প আর গল্প

কিশোর গল্প—*বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়*
কিশোর গল্প—*খগেন্দ্রনাথ মিত্র*
কিশোর গল্প—*সুবোধ ঘোষ*
কিশোর গল্প খেলা—*সম্পা. অশোক সেন*
পাঁচদশকের কিশোর গল্প—*সম্পা. অশোক সেন*
অ্যাডভেঞ্চারের গল্প—*সম্পা. অশোক সেন*
মজার গল্প—*সম্পা. তারাপদ রায়*
কিশোর সাহিত্য সম্ভার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
—*সম্পা. অশোক সেন*
মৌমাছি রচনা সম্ভার—*সম্পা. কার্তিক ঘোষ*
ছোটোদের নাটক—*সুনির্মল বসু*
রোমাঞ্চ বনে বনে—*মনোজ বসু*
মুঙ্গু—*অজেয় রায়*
হারে রে রে রে রে—*সম্পা. কার্তিক মজুমদার*
টাটকা ভূত বাসি ভূত—*সম্পা. হীরেন চট্টোপাধ্যায়*
কায়াহীনের কাহিনী—*মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়*
ভূত পুরাণ—*তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়*
ভূত ভূত অদ্ভুত—*কার্তিক ঘোষ*
টুনটুনি ও বাঘের গল্প—*উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী*
পাগলা দাশু—*সুকুমার রায়*
শ্রীশ্রীচণ্ডীর গল্প—*হীরেন চট্টোপাধ্যায়*
বাঁদর ভালুক ডুগডুগি—*সুধীন্দ্র সরকার*
লালুর গল্প—*সেরজো স্ক্যাপাগনিনি*
ইন্সপেক্টর রনি—*অনীশ দেব*
ছোট্ট একটা স্কুল—*শঙ্খ ঘোষ*

জ্ঞান-বিজ্ঞান

বিশ্বসেরা বিজ্ঞানী—*শ্যামল চক্রবর্তী*
বিশ্বপরিচয় আফ্রিকা—*পীতম সেনগুপ্ত*
বিশ্বপরিচয় ইয়োরোপ—*পীতম সেনগুপ্ত*
হাজার রকম কেন?—*অসিত চক্রবর্তী*
ভূমিকম্প—*দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*
নদী—*দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*
অভিযানের কথা—*দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়*
মেঘ বৃষ্টি ঝড়—*দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়*
আকাশভরা সূর্যতারা—*জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়*
জলযানের ইতিহাস—*অনিমেষকান্তি পাল*
আকাশযানের কথা—*অনিমেষকান্তি পাল*
গাবলুর বিজ্ঞান ডায়েরি—*বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী*
মহাকাশের কথা
সন্দেশ রহস্য
আমিও পারি
সভ্যতার ইতিহাস—*প্রবোধচন্দ্র সেন*
বারোমাসের কথা—*সাধনা মুখোপাধ্যায়*
জলের কথা—*অমিত চক্রবর্তী*
আলোর কথা—*পলাশবরণ পাল*
পশ্চিমবঙ্গ পরিচয়—*বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায়* **(নতুন সংস্করণ)**
আমাদের ভারত—*নিমাই ভট্টাচার্য* **(নতুন সংস্করণ)**
কুট্টিমামার বিজ্ঞান চর্চা—*প্রদীপ্ত সেন*

চিরকালের সেরা

সুনির্মল বসু	সুকুমার রায়
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	লীলা মজুমদার
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা - ৭০০ ০০৯

বইমেলার বই

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের
বইব্যবসা ও পাঁচ পুরুষের বাঙালি পরিবার

(কোনও গল্প নেই, নিখুঁত তথ্যসমৃদ্ধ রচনা)

১৮৮০ সালে বরদাপ্রসাদ মজুমদার হাওড়া জেলার পাতিহাল থেকে কলকাতায় এলেন। জমিদারি ছেড়ে শুরু করলেন বই ফেরি। তাঁর শুরু করা সেই ব্যবসা পাঁচ পুরুষের হাত ধরে নতুন শতাব্দীর পঞ্চদশ দশকে প্রবেশ করল। কিভাবে, কতটা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, দেশে-বিদেশে দুর্লভ এরকম একটি প্রতিষ্ঠান দেড়শ বছরের দিকে এগিয়ে চলেছে? নির্ভীক, নির্মোহ লেখনীতে অবিচ্ছিন্ন সেই ধারাবাহিকতার সম্পূর্ণ দলিল।

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর
আমাকে চেনো

সবল ও সুস্থ থাকার চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এই বইটির মধ্যে। বইটি হাতের কাছে থাকলে অনেক অসুখ-বিসুখকেই দূরে সরিয়ে রাখা যাবে। আমরা যদি আমাদের শরীরকে চিনি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি জানি ও তাদের সুস্থ রাখতে পারি তাহলে শুধু দীর্ঘজীবীই হবো না, নীরোগ হয়ে বেঁচে থাকবো। স্কুল, কলেজ, ডাক্তারি, নার্সদের ট্রেনিংয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বইটি একটি অমূল্য সম্পদ।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শঙ্করকন্যার কাছে

অমরকন্টক থেকে নর্মদার ধার ধরে সোজা আরব সাগর। দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমাবাসীরা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। গভীর জঙ্গল, রুক্ষ পর্বত, হিংস্র জীবজন্তু, ভয়ঙ্কর ডাকাতে ভরা এই পথে আছে অজস্র শিবমন্দির। আছে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের ওঁকারেশ্বর, আছে রাজরাজেশ্বরী মন্দির, আছে শূলাপাণি ঝাঁড়ি। আর আছেন পিতা-পুত্রী—শিবশঙ্কর ও নর্মদা মাঈ। বিপদে-আপদে তাঁরাই রক্ষা করেন পরিক্রমাবাসীদের, যোগান ক্ষুধার অন্ন।

ছোটদের জন্যে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গুপ্তধন রহস্য
(রহস্য সিরিজের নবম বই)

সুভাষ ধরের
লস্করহাটের দুই শয়তান
(সত্য ঘটনা অবলম্বনে পুলিশি কাহিনী)

গৌরী দের
রাত তখন বারোটা
(শিহরন জাগানো ভৌতিক কাহিনী)

নব কলেবরে

হেমেন্দ্র কুমার রায়ের

(তিনখণ্ডে ১১টি বই)

কিং কঙ
(কিং কঙ, অমানুষিক মানুষ, ভগবানের চাবুক, আলেকজান্ডার দি গ্রেট)

গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন
(গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন, বাঘরাজের অভিযান, চতুর্ভুজের স্বাক্ষর, নিশাচরী বিভীষিকা)

দেড়'শ খোকার কাণ্ড
(দেড়'শ খোকার কাণ্ড, সুন্দরবনের মানুষ বাঘ, আধুনিক রবিনহুড ও নেপোলিয়ন)

টার্জান সিরিজ

(চারখণ্ডে ১৩টি বই)

টার্জান দি এপ্‌ম্যান
(টার্জান দি এপ্‌ম্যান, অ্যাড্‌ভেঞ্চার অব্ টার্জান, টার্জান এন্ড হিজ মেট্)

টারজান দি ফিয়ারলেস
(টারজান দি ফিয়ারলেস, টারজান এন্ড হিজ সন, টারজান দি মাইটি)

টার্জান এ্যান্ড দি ট্রেইটর
(টার্জান এ্যান্ড দি ট্রেইটর, টার্জান ইন দি জাঙ্গল, টার্জান দি গ্রেট)

টার্জান এ্যাণ্ড হিজ ফ্রেণ্ড
(টার্জান এ্যাণ্ড হিজ ফ্রেণ্ড, টার্জান ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড, টার্জান ফাইটস ফর্ লাইফ্, টারজান দি হিরো)

শিবরাম চক্রবর্তীর—হিপ হিপ হুররে

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড ■ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯